দুইবার শ্রীকৈলাশ দর্শন

যতীন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

EAST AND WEST PUBLISHERS
(*Director*-PROPRIETOR SHRIMATI BIJOLI GANGULI)
19 PARK SIDE ROAD, CALCUTTA 26, INDIA

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

PRINTED BY P. B. ROY AT PRABARTAK PRINTING AND HALFTONE LTD.
52/3, BEPIN BEHARI GANGULY STREET, CALCUTTA 12.

ওঁ শিবায় নমঃ

কত দিন এসেছে, চলে গেছে,
কত সৃষ্টি, কত প্রলয় হয়েছে,
বায়ু বয়ে গেছে, আলো আঁধারে মিশেছে,
তোমার ধ্যান না ভেঙ্গেছে।
স্থির নির্বিকার, কৈলাশ শিখরে
যুগ যুগ ধরে
কোন্ অজানারে জানিবারে ?
হে যোগেশ্বর প্রণমি তোমারে।
আমি বিচলিত, পারি না বুঝিতে,
মনে প্রশ্ন সংশয়, চাহি জানিতে।
কেন এ আসা যাওয়া, জীবন মরণ ?
কেন গড়া ভাঙ্গা দুঃখের কারণ ?
কেন বাসনা কামনা নাহি যার পুরণ ?
কেন আশার স্বপন অকারণ ?
কেন দেওয়া অনুভব, কেন আসক্তি ?
কেন দেওয়া স্মৃতি, বয়ে আনে দুস্মৃতি ?
কাহার এ লীলা, কিসের কারণ ?
নিষ্পেসিত প্রাণীর জীবন।
ব্যাকুল, চঞ্চল মন আমার,
তুমি কেমনে স্থির নির্বিকার ?
হে মহাযোগী তোমায় নমস্কার।
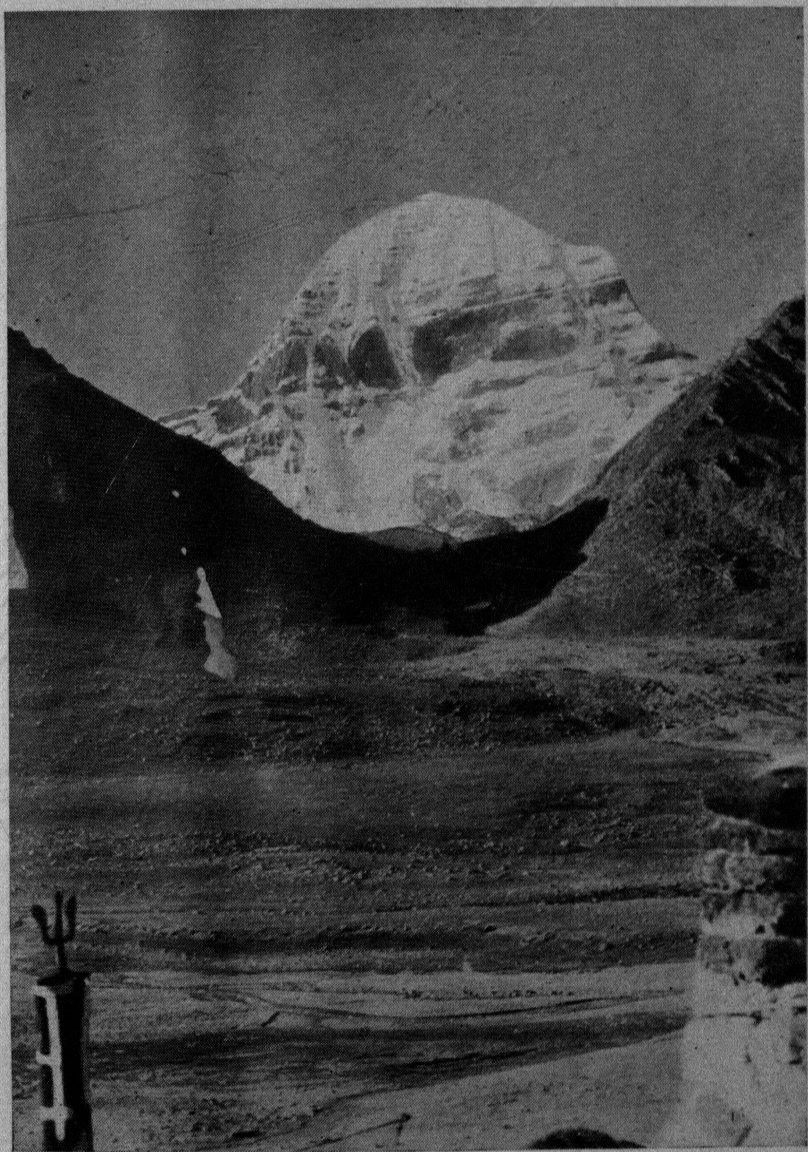
শ্রীকৈলাশ

দুইবার শ্রীকৈলাশ দর্শন

১

তিব্বত

তিব্বতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম তৃভিস্থপা Trivishthapa পূর্ব্বে তৃভিস্থপা আর্য্যাবর্ত্ত বা ভারত হইতে এখনকার মত বিচ্ছিন্ন একটা বিদেশের মত ছিল না। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরানে তিব্বতের উল্লেখ অনেক স্থানেই আছে। কৈলাশে শিবের আরাধনায় যাইবার কথা ঐসব গ্রন্থে অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। রাবণরা তিন ভাই কৈলাশের পাদদেশে যে হ্রদের তীরে বসিয়া তপস্যা করেন সেই হ্রদের নাম হইয়া যায় রাক্ষসতাল। এখনও সেই নাম চলিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মাও কৈলাশের নিচে তপস্যায় বসেন। তপস্যার জন্য তাঁহার মনে এক হ্রদ সৃজনের ইচ্ছা হওয়ায় যে হ্রদ সৃজিত হয় তাহার নামই মানস সরোবর। সত্যযুগের মান্ধাতার নামে এখনও মান্ধাতা পাহাড় মানস সরোবরের দক্ষিণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই তিব্বতই যক্ষ রাজা কুবেরের স্থান যেখানে এখনও স্বর্ণখনি আছে।

এই রকম রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে উল্লিখিত অনেক নাম তিব্বতে এখনও বিদ্যমান। তিব্বতে গিয়া এইসব দেখিলে

বোঝা যায় যে ঐ সব গ্রন্থের কাহিনী কেবল কল্পিত নহে। আরও বোঝা যায় যে মাঝে হিমালয়ের বিরাট উচ্চ প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যাওয়া-আসা, যোগা-যোগ যথেষ্ট ছিল।

তখনকার দিনে ভিন্ন ভিন্ন রাজা ও রাজ্য থাকিলেও এক রাজ্য হইতে আর এক রাজ্যে যাইবার জন্য পাসপোর্ট ও ভিসার প্রচলন ছিল না। এবং যাহাকে বলে foreign exchange তাহারও নিয়ম কানুন ছিল না। আজকাল আন্তর্জাতিক সভা করিয়া বড় বড় বক্তৃতা ও প্রস্তাব করা হয় যে দেশ, ধর্ম্ম, জাতি, নির্ব্বিশেষে সব মানুষের সম অধিকার; কিন্তু নিজের ছোট্ট দেশের গণ্ডির ওপারে ইচ্ছামত যাইবার অধিকার ও স্বাধীনতা মানুষের নাই। পূর্ব্বে চীন ও অন্যান্য কত দেশ হইতে কত পরিব্রাজক, কত শিক্ষার্থী বিনা রাজনৈতিক বাধায় ভারতে আসিয়াছে, ভারত হইতেও বাহিরে গিয়াছে। নালন্দা ও তক্ষশীলাদি শিক্ষা কেন্দ্রে জ্ঞানানুরাগী কত বিদেশী আসিয়াছেন, ভারত হইতেও বৌদ্ধ ভিক্ষু বুদ্ধের বাণী এসিয়া ইউরোপে দূর দূর স্থানে লইয়া গিয়াছেন।

সুদূর Caspian Sea-র উপকূলেই বোধ হয় কাশ্যপ ঋষির আশ্রম ছিল। চীন দেশে মহাদেবী তারার মন্দির ছিল। এখনও খুঁজিয়া দেখিলে নিশ্চয় ভারতে পূজিত অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তির ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ চীনে পাওয়া যাইবে। দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গ সম্ভবতঃ উত্তর চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় ছিল।

ব্রহ্মার বাসভূমি সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, ও উত্তর সাইবেরিয়া অঞ্চলে থাকা সম্ভব যেখানে প্রায় ছয় মাস দিন ও ছয় মাস অন্ধকার। বালটিক সির পূর্ব্ব উপকুলে লিথুয়ানিয়া। সেখানকার পৌরানিক ইতিহাসে ইন্দ্র, বরুণ, ও অন্যান্য দেবতার নাম এবং গঙ্গা যমুনা এবং ভারতে সুপরিচিত আরও অনেক নাম পাওয়া যায়। সেইরকম ইণ্ডোনেশিয়াতেও পাওয়া যায়। ইহাতেই বোঝা যায় যে দেশ, রাজ্য, রাজা ভিন্ন হইলেও রাজ্যে রাজ্যের মধ্যে যাওয়া আসায়, মেলা মেশায় এখনকার মত রাজনৈতিক বাধা বিঘ্ন ছিল না। হস্তিনাপুরের ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী গান্ধারের (আফগানিস্থানের) রাজকন্যা। তাঁহার ভাই পাণ্ডুর এক স্ত্রী মাদ্রী মদ্রদেশ বা মাদ্রাজের মেয়ে। এখন ভারতের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিক ভাষা লইয়া বিরোধ ও রেষারেষি, এবং বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রোজী, ইত্যাদি নাম লইয়া দলাদলির যেরূপ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে ভারতের মধ্যেই চলা ফেরা কঠিন হইবার উপক্রম হইয়া আসিতেছে, ভারতের বাহিরে যাওয়া ত দূরের কথা।

ভারতের বাহিরে অন্য দেশে যাওয়ায় অনেক হাঙ্গামা থাকিলেও যাঁহারা উপায় জানেন তাঁহারা যাইতে পারেন, কিন্তু চীন অধিকৃত হইবার পর তিব্বতে যাওয়া আর সম্ভব নহে। যাঁহারা তিব্বতে গিয়াছেন, তিব্বতের কিছু দেখিয়াছেন ও জানিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা না যাইতে পারার চেয়ে তিব্বতে না যাইতে পারা অনেক বেশি

দুঃখের, কারণ তিব্বতের যে একটা বৈশিষ্ট আছে তাহা বোধ হয় আর কোথাও নাই।

উত্তরে ও দক্ষিণে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত জুড়িয়া পাহাড়, তাহার মাঝে তিব্বত এক বিস্তৃত মালভূমি যাহার উচ্চতা গড়ে প্রায় ১২০০০ হইতে ১৬০০০ ফিট। এত উচ্চ, এত বিরাট, বিস্তৃত মালভূমি আর কোথাও নাই এবং আর কোনও মালভূমি এইরকম দুই পাশে পর্ব্বত শ্রেণীর মাঝে যেন জগৎ ছাড়া হইয়া মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ বিমোহিত হইয়া অবস্থিত নহে। এখানে আসিয়া দাঁড়াইলে মনও যেন ঐরূপ উর্দ্ধে ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ বিমোহিত হইয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডের এই মুক্ত বিরাট চিত্রপটে জীবনের ছোট খাট কথা, বিষয় ও ব্যাপার যাহার মধ্যে আমাদের দৃষ্টি, চিন্তা, কর্ম্ম, প্রয়াস সব আবদ্ধ থাকে এবং যাহার দরুণ আমরা সুখ দুঃখ হাসি কান্নার খেলায় অভিভূত হই, তাহা সব যেন ফিকে ও অর্থহীন হইয়া যায়! আমাদের হাতে গড়া চার দেওয়ালের খেলাঘরের বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের স্থান কোথায়, কিভাবে আমাদের জীবন ইহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট, মন তাহা নির্বাক হইয়া ভাবে।

সত্যই এখানকার স্নিগ্ধ শান্তি ও নীরবতা মনকে প্রভাবিত করে। প্রকৃতি এখানে মানুষের হস্তক্ষেপ হইতে নির্ভয়ে বিরাজিত। এখানে মানুষ আছে, কিন্তু মানুষের আর প্রকৃতির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। একের অপরকে বশে আনিবার

চেষ্টা ও প্রতিযোগিতা নাই। দুইয়ের মধ্যে একটা সহজ বোঝা-পড়া রহিয়াছে বলিয়াই এখানে এমন শান্তি, এমন harmony বিরাজ করে যে মন তাহাতে স্বতঃই অভিভূত হয়। দক্ষিণ ভারতের স্বামী প্রণবানন্দ যিনি বহুবার কৈলাশ গিয়াছেন, শীতে গ্রীষ্মেও সেখানে কাটাইয়াছেন, তাঁহার বইতে লিখিয়াছেন যে মানস সরোবরের তীরে স্থির হইয়া বসিলে অন্তরে যেন এক vibration অনুভূত হয়। আমি উঁহার মত ওখানে দীর্ঘ সময় কাটাইনি সেইজন্য ঐ বিষয় কিছু জানি না, তবে আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠে যে শিবের যে ধ্যানস্থ মূর্ত্তি আমরা কল্পনা করি সে মূর্ত্তি কৈলাশ শিখরে অধিষ্ঠিত মনে করি কেন। তিব্বতই কি জগতে ধ্যানের শ্রেষ্ঠ স্থান যে কারনে শিব এখানে কালকে জয় করিয়া অনন্ত যোগাসনে বসিয়াছেন ? আরও মনে হয় রাবণরা কেন দূর লঙ্কা হইতে এই তিব্বতেই তপস্যা করিতে আসিয়াছিলেন ? কেন ব্রহ্মা পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও না গিয়া তিব্বতে আসিয়া ধ্যানে বসিয়াছিলেন ? কেন পাণ্ডবদের বলা হইয়াছিল হিমালয়ের উপরে মহাপথ ধরিয়া তিব্বতে যাইতে ? কেন আরও কত জ্ঞানী, যোগী যোগ সাধনার্থ এই তিব্বতে আসিয়া বসিয়াছিলেন ? আর কেনই বা তিব্বতে আসিয়া আমার মনে এইরকম প্রশ্ন উঠিয়াছিল ?

অন্যত্র পাহাড়ে পর্বতে চলিবার সময়েও মন সক্রীয় ও চিন্তান্বিত হয়, মনে প্রশ্ন উঠে, মন ভাবান্বিত হয়, কিন্তু তিব্বতে কেবল তাহাই নহে, এখানে এই উচ্চ প্রশান্ত মালভূমির উপর

চলিবার সময় চোখের সামনে এমন এক বিরাট সীমাহীন perspective আসে যাহার উপর জীবনের কাহিনী, সংসারের খুটিনাটি যেন আর এক ভাবে দেখায়। আমরা ঐ সবকে যে গুরুত্ব দিই সেই গুরুত্ব যেন এই বিশাল পটভুমিতে অর্থহীন হইয়া যায়, এবং ঐ গুরুত্ব দেওয়ার কারনে মনে যে অশান্তি, শোক, দুঃখ ও বিক্ষিপ্ততা আসে তাহা চলিয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয় এখানে ধ্যানে ও গভীর চিন্তায় একাগ্রতা আসে।

দেবালয়ে ও তীর্থস্থানে লোকে যায় লোভ ও কামনা লইয়া। সেখানে গিয়া বলে "দেহি, দেহি।" কিন্তু এখানে মানুষের করা মন্দির ও মূর্ত্তি নাই। এখানে চারিদিকে খোলা উঁচু নিচু ঢালু জমির উপর দিয়া দৃষ্টি চলিয়া যায় অবাধে দূর আকাশ পর্য্যন্ত। একটা গাছও সামনে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি অবরোধ করে না। আর উপরে আকাশের দিকে চাহিলেও দৃষ্টি চলিয়া যায় শূন্যের ভিতর যেখানে বোধ হয় চলিয়া গিয়াছিল বুদ্ধের দৃষ্টি নির্ব্বানের সন্ধানে। এখানে কি চাহিব, কাহার কাছে চাহিব, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। তাই মুখে দেহি দেহি আসে না। কামনার ও লোভের সব বস্তুই যেন অকিঞ্চিতকর মনে হয়।

তিব্বত সত্যই যেন জগৎ ছাড়া। এখানকার মাটি, জল, বাতাস সবই যেন এখানকারই, জগতের জল মাটি হইতে পৃথক। তাই বোধ হয় জগৎ দেখার পর যখন লোক বহির্জগতের সন্ধান চাহিয়াছে তখন এখানে আসিয়া ধ্যানে বসিয়াছে। তিব্বত পুন্য

ভূমি কি না জানি না, তবে ধ্যানের ও চিন্তার নিশ্চয় উপযুক্ত স্থান। দিক হীন, পথ হীন হইয়া এখানে চলিবার সময়ে সঞ্চিত সংস্কার, ধারনা ও বিশ্বাসের আটক ও বন্ধন হইতে মন মুক্ত হয়। গুরলা লার উপর উঠিয়া যখন সামনে কৈলাশ, তলায় মানস সরোবর ও রাক্ষস তাল দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া প্রনাম করিলাম তখন এক মহা তৃপ্তি, পূর্ণ সন্তোষ ভিন্ন আর কোন ভাবই মনে ছিল না। নদী যেমন সমুদ্রে পড়িলে তার কিছু বলিবার থাকে না, তার স্রোত, চাঞ্চল্য সব চলিয়া যায়, যাহার উদ্দেশে চলিয়া আসিয়াছে তাহাকে পাইয়া তাহার সহিত মিলিয়া যায়, সেই রকমই সে সময় আমার কিছু বলিবার ছিল না। মনে কোন আকাঙ্খা, লোভ, বাসনা, উত্তেজনা ছিল না। ক্ষুদ্রে নদী মহাসমুদ্রের সহিত মিলনে নিজের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যায়, নিজের পৃথকতা, নিজের অস্তিত্ব হারায়, সেইরকমই সেই অল্পক্ষন আমারও নিজের ক্ষুদ্রতা, নিজের পৃথকতা জ্ঞান ছিল না। সেই বিরাট দৃশ্য একটা বিরাট অনুভব আনিয়া দিয়াছিল যাহাতে আমার ব্যক্তিত্ববোধ সে সময় চলিয়া গিয়াছিল।

তিব্বতে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মঠ আছে। তাহা মন্দির দেবালয়ের মত নহে। সেখানে শান্ত পরিবেশ, আওয়াজ, শব্দ, গোলমাল নাই। পয়সা প্রণামি দেওয়া নেওয়া নাই। নীরব শৃঙ্খলার সহিত সেখানে সব কাজ কর্ম্ম হয়। মঠের ভিতর বই পুঁথিও আছে, কোন কোন মঠে বহু সহস্র

মূল্যবান গ্রন্থ আছে, যাহা ভারতে নাই যেখানে বুদ্ধের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্ম।

ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে বিহারে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্ম, কিন্তু গভীর, প্রগাঢ়, profound এই ধর্ম্মকে ভারত হইতে দূর দেশে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। ভারতে যেমন যেমন হিন্দুর মধ্যে সংকীর্ণতা আসিল, গোঁড়ামি আসিল, তেমন তেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ভারত হইতে সরিয়া বাহিরে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল যেখানকার অধিবাসীরা মুগ্ধ হইয়া ইহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইল।

সনাতন ধর্ম্মের বিশেষ বৈশিষ্ঠ ছিল ইহার উদারতা, ইহার অনন্ত, অসীম ব্রহ্মের কল্পনা। যখন ঐরূপ ধারণা ও কল্পনার পরিবর্ত্তে সংকীর্ণতা ও জ্ঞানহীনতা আসিল তথনই তাহার পতন আরম্ভ হইল। এই সংকীর্ণতাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর আক্রমণের কারণ হইল। শঙ্করাচার্য্য পতনোম্মুখ হিন্দুধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করায় আত্মনিয়োগ না করিয়া এবং সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ ভাব, উচ্চ ধারণা, উচ্চ জ্ঞানের প্রচারে মন না দিয়া, মন দিয়াছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভুল ত্রুটি দেখাইতে। যেমন কি খ্রীষ্টান মিশনারীরা নিজের ধর্ম্মের মহিমা যতটা না প্রচার করে তাহা অপেক্ষা বেশি চেষ্টা করে অন্য ধর্ম্মকে হেয় করিতে।

তাঁহার এইরূপ mission এর ফলে হিন্দুধর্ম্ম আরও ক্ষীন, আরও সংকীর্ণ হইয়া গেল এবং হিন্দু অন্ধ বিশ্বাসে ও

অজ্ঞানের মধ্যে আরও ডুবিয়া গেল। নানা সম্প্রদায়ে, নানা সংগঠনে হিন্দু বিভক্ত হইয়া গেল। সনাতন ধর্ম্মের সার মর্ম্ম বিস্মৃত হইল। কেবল ধর্ম্মে নহে সব বিষয়েই হিন্দুর অবনতি বাড়িয়া চলিল। হিন্দুর জ্ঞানানুরাগ চলিয়া গেল। সেই কবে কখানা বেদ উপনিষদ আর একখানা গীতা লেখা হইয়াছিল তাহাই লইয়া হিন্দু জ্ঞানের পথে থামিয়া গেল। আর নুতন কোন উপনিষদ, কোন গীতা কেহ লিখিতে পারিল না। যেন এই ব্রহ্মাণ্ডের সব তথ্য, সব রহস্য ঐ কয়খানা বইতে দেওয়া আছে। দেবর্ষি নারদ একদা বলিয়াছিলেন যে সর্ব্ব শাস্ত্র পাঠ সত্ত্বেও এবং সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও ব্রহ্ম ও আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই। কিন্তু আজকাল সেই নারদের দেশে পাড়ায় পাড়ায়, গলিতে গলিতে, আশ্রমে অধিষ্ঠিত ধর্ম্ম যাজকেরা সবই জানেন। সৃষ্টীকর্ত্তা ভগবানের খেলা, লীলা সবই বোঝেন, তাঁহার পেটে মনে কি ভাবনা, কি কথা, সবই এই ধর্ম্ম গুরুদের বিদিত। ভগবানের সাক্ষাতে যাইবার পথও তাঁহারা শিষ্য শিষ্যাদের দেখাইয়া দিবার জন্য সদাই ব্যগ্র। ভগবান সম্বন্ধে কথা উঠিতে একজন সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে একবার বলিয়াছিলেন একখানা মাসিক পত্রিকার নাম করিয়া ঐমুক্ পত্রিকা পড়ুন, সব জানতে পারবেন। মনে হল জিজ্ঞাসা করি যে যদি আপনার ভগবান সম্বন্ধে সবই দেখা শোনা জানা আছে, তিনি কেমন, কোথায় থাকেন, কোন পথে তাঁহার কাছে পৌঁছান যায়, কিছুই যদি আপনার অজানা

নাই তাহলে আপনি তাঁহার কাছে না গিয়া এখানে কেন নানা দুর্ভোগে পড়ে আছেন ? কিন্তু এরূপ প্রশ্ন করিলেই উঁহারা এমনি উত্তেজিত হইয়া ওঠেন যে সেখানে আর দাঁড়ান যায় না। A Visit to Heaven and Hell কাহিনীতে এ বিষয়ে আরও কিছু লিখিয়াছি।

শঙ্করাচার্য্যের জীবন কাহিনী পড়িলে মনে এই দুঃখ হয় যে উঁহার মত মেধাবী, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কেন সনাতন ধর্ম্মের পুনরুত্থানে নিজের অসাধারণ জ্ঞান ও যুক্তি না প্রয়োগ করিয়া স্থানে স্থানে মিশনারীদের মত বৌদ্ধদের তর্ক-বিতর্কের দ্বারা পরাস্ত করিতে গিয়াছিলেন। ফুল যখন নিজের সৌরভ ছড়াইয়া দেয় সে তখন অন্য ফুলের সৌরভকে চাপিতে বা ক্ষুণ্ণ করিতে চায় না। নিজের যাহা দিবার তাহাই ছড়াইয়া দেয়।

শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্মকে খর্ব্ব করিলেও হিন্দু ধর্ম্মকে তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই, বরং তাঁহার missionery zeal, যাহা সনাতন ধর্ম্মের এবং গীতার শিক্ষারও বিপরীত, সে সময়কার অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারে নিমজ্জিত হিন্দুকে আরও গোঁড়ামি ও অজ্ঞতার অন্ধকারের ভিতর ঠেলিয়া দিয়াছিল। হিন্দু তাঁহাকে অবতার মনে করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা হইতে আরও সরিয়া গিয়া তাঁহার কথাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল।

শঙ্করাচার্য্যের বিষয় ভাবিলে আরও মনে হয় যে উনি যে সুক্ষ্ম যুক্তি বিচারের দ্বারা বৌদ্ধ পণ্ডিতদের পরাস্ত করার চেষ্টা করেন সেই যুক্তি বিচার নিজের লেখায়, ধর্ম্ম গ্রন্থের নিজের টিকায় ও ভাষ্যে কেন প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার গীতার ভাষ্যে কোন Criticism, কোন সমালোচনা নাই। গীতার প্রতি কথাই যেন ভগবদোক্তি, এই ভাবে মানিয়া লইয়াছেন ও সমর্থন করিয়াছেন। অথচ কেবল গীতায় কেন সব গ্রন্থেই এমন কিছু থাকে যাহা নির্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায় না। অন্ধ বিশ্বাসে মানিয়া লইবার ফলেই হিন্দু-ধর্ম্মের উৎকর্ষ বহুদিন হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন ধর্ম্ম গ্রন্থের কোন কথারই বিচার করা ঘোরতর অন্যায় বলিয়া বলা হইয়াছে। ফলে দেখা যায় যে যাঁহারা ধর্ম্ম পুস্তকাদি routine duty-র মত পড়েন তাঁহারা ঐ সব গ্রন্থের সারমর্ম্ম লইতে পারেন না এবং নিজের জীবনে তাহার কোনটাই প্রয়োগ করেন না। গীতার যত ভাষ্যই হইয়াছে তাহার কোনটাতেই Critical study নাই, কোন সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্থাপন নাই। এই জন্য হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থ গুটিকতক থাকিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা বাড়ে নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে কিন্তু অনেক কিছু লেখা হইয়াছে। তিব্বতে অনেক মঠেই অনেক গ্রন্থ সযতনে রক্ষিত ছিল। কিন্তু তাহা অধুনা অজ্ঞানী উন্মত্ত আক্রমণকারীর হাতে ধ্বংস হইয়াছে। তিব্বত অধিকৃত হওয়া অপেক্ষা এইসব

গ্রন্থের ধ্বংস অধিক দুঃখের, কারণ তিব্বত হয়ত আবার কোন দিন স্বাধীন হইতে পারে, কিন্তু ঐ সব গ্রন্থে যে কত জ্ঞানী, কত সাধকের গভীর চিন্তা, গভীর অভিজ্ঞতা লেখা ছিল তাহা আর জগৎ জানিবে না।

জগতে এই এক ফালি জমি, তিব্বত, ছিল যেখানকার লোক কাহাকেও হিংসা করে নাই, কাহারও কিছু লোভ করে নাই কাহারও নিকট কিছু চাহে নাই। প্রকৃতির যাহা কিছু দেওয়া নেওয়া বিনা কথায় সন্তোষের সহিত মানিয়া লইয়া নীরবে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। ১৯৪১ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়া হুনিয়ারা যখন তিব্বতে প্রবেশ করে তাহাদের বাধা দিবার মত সেখানে যথেষ্ট পুলিশ ছিল না। তাকলাকোটে ভোটিয়ারা আমাকে বলিয়া দেয় আলমোড়ায় ফিরিয়া সেখানে গভর্ণমেণ্টকে বলিতে তাহাদের রক্ষার জন্য বন্দুক ও সৈন্য পাঠাইতে।

এখানকার লোকেরা বাহির হইতে অন্য রাজ্যের আক্রমনের সম্ভাবনা ভাবে নাই। যাহারা এখানে আসিয়াছে তাহাদের বাধা দেয় নাই। তবে যাহারা গিয়াছে তাহারা বিদ্বেষ, লোভ বা বৈরিভাব লইয়া যায় নাই। গিয়াছে শান্তির জন্য, ধ্যান, চিন্তা, তপস্যার জন্য। ত্রিভুবন জয়ী রাবণ এখানে আসিয়াছিলেন নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে নয়, আসিয়াছিলেন এই তপোভূমিতে বসিয়া তপস্যা করিতে। কিন্তু এখন আক্রমনকারীরা আসিয়াছে এই স্থান দখল

করিতে, এখানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে। তাই পবিত্র-ভূমি তিব্বত আজ মিলিটারির বুটজুতায় নিস্পেষিত, ইহার বক্ষ্য ক্ষত বিক্ষত করিয়া পথ হইয়াছে যাহার উপর দিয়া সশব্দে ছুটিয়াছে সেনাবাহিনী লইয়া মিলিটারি জিপ ও ট্রাক। উপরে প্রশান্ত নীল আকাশ ভেদ করিয়া চলিয়াছে কর্কষ গর্জ্জনে এওরোপ্লেন। তিব্বত মানুষের হিংসা লোভ হইতে রক্ষা পাইল না। দিবালোকে সকলের সামনে তাহার উপর আক্রমন হইল কিন্তু কেহই, কোন দেশই এই অরক্ষিত দেশের ও এখানকার নিরুপায় লোকের সাহায্যে দাঁড়াইল না। সভ্য জগতের, সভ্য মানুষের এই স্বভাব, এই নিয়ম।

কিন্তু এই সভ্য মানুষ যখন লোভ, মোহ, আকাঙ্খা, উচ্চাশার পিছনে ছুটিয়া ক্লান্ত হইবে, মনে তাহার বিরক্তি ও অবসাদ আসিবে, যখন সে তাহার বিক্ষিপ্ত অশান্ত মনকে শান্ত করিতে চাহিবে, তখন তাহার এই তিব্বতের কথা মনে আসিবে। তখন সে চাহিবে মানস সরোবরে বসিয়া কৈলাশ শিখরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কালজয়ী, চির অবিচলিত, প্রশান্ত শিবমূর্ত্তির ধ্যানে বসিয়া মনের অশান্তি, চাঞ্চল্য দূর করিতে। তখন সে চাহিবে তিব্বত আবার সেই আগেকার তিব্বত হউক। কিন্তু তাহা কি আর হইবে ?

২

১৯৪১

জীবনস্রোতে যতই ভাসিয়া চলিয়াছি, যতই দেখিতেছি এই স্রোতের প্রবাহ এদিক ওদিক উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আমাকে নানাভাবে নানা গতিতে টানিয়া কোন্ এক অজানা গন্তব্যের দিকে লইয়া চলিয়াছে, আমার ইচ্ছা, চেষ্টা, হাত-পা নাড়া কিছুই যে টানের কোন ব্যতিক্রম বা পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না, ততই নিজের অসহায়তা উপলব্ধি করিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে মানুষের ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যম সবই বৃথা, কিছুই কাজে আসেনা। এই স্রোতের দিক বা গতি নিবারিতে, তাহাকে আয়ত্বে আনিতে, মানুষের সাধ্য নাই। পূর্ব্বে যে আত্মবিশ্বাস ছিল, নিজের পুরুষকারের উপর যে নির্ভরতা ছিল, দিন দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত তাহা যেন শিথিল হইয়া যাইতেছে। মহাভারতে মুনি-ঋষিরা অনেক স্থলেই দৈবই যে বলবান, দৈবের গতি যে অব্যাহত ভাবে চলিয়া যায় তাহা নানাভাবে বলিয়াছেন, অথচ তাঁহারা পুরুষকার হইতে বিরত থাকিতেও বলেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে মানুষ পুরুষকারের ব্যর্থতা, নিরর্থকতা যতই দেখুক, বুঝুক না কেন, আশা, বাসনা, চেষ্টা,

উদ্যম হইতে বিরত থাকিতে পারে না! প্রকৃতি যেন নিজের কোন উদ্দেশ্য সাধনে কেবল মানুষ কেন নিজের সব সৃষ্ট জীবকেই নানারূপ বৃত্তি, প্রবৃত্তি এবং শারীরিক ও মানসিক তাড়না দিয়া সর্ব্বক্ষণই কোন না কোন প্রকার কর্ম্মে লিপ্ত রাখিয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা না করিলেও কি অর্জ্জুন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন? যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া বনে গিয়া জপ তপে বসিলেও কর্ম্ম ছাড়িত না, আর মোহ, কামনা, বাসনাদিও যাইত না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মশূন্য হইতে বলেন নাই, কারন তাহা সম্ভব নয়, বিশেষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন যে "তুমি যুদ্ধ না করিলেও যাহা হইবার তাহা হইবে।" কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে যদি যাহা হইবার তাহাই হইবে, যদি যুদ্ধের ফলাফল দৈব-নির্দ্ধারিত, তবে অর্জ্জুনকে রণে চেষ্টা ও পুরুষকার প্রয়োগ করিতে বলা কেন? আসল কথা দৈবই বা কি আর পুরুষকারই বা কি, আর উহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, এ রহস্য কেহ কখন ভেদ করিতে পারেন নাই তা তিনি মুনি-ঋষিই হোন্ বা গীতাকারই হোন্।

দৈব না পুরুষকার—এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় সর্ব্বদাই মানুষের জ্ঞানের বাহিরে থাকবে। যখনি মানুষ কিছু তাহার চেষ্টার বাহিরে হইতে দেখে তখনি সে দৈবই সব মনে করে, আবার যখন প্রবৃত্তির তাড়নায়, বাসনা উৎসাহের আবেগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তখনি তাহার নিজের চেষ্টায় ও পুরুষকারে বিশ্বাস

ফিরিয়া আসে। তখন সে মনে করে দৈবই সব এবং একমাত্র ফল নির্দ্ধারক হইতে পারে না, কারণ অনেক পুরুষকারেরই ত ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা ও পাওয়া যায়। দৈনিক নিত্য কর্ম্ম এমন কি চলা ফেরা, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি কর্ম্মে যে চেষ্টা ও পুরুষকার আছে তাহার অধিকাংশই প্রায় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। তবে এ ক্ষেত্রেও কিন্তু বলা যায় যে দৈনিক কর্ম্মের প্রবৃত্তিও দৈব হইতে উৎপন্ন ও তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কারণ দেখা যায় যে প্রতিদিনই একরূপ প্রবৃত্তি থাকে না। কোন দিন বেশ উদ্যম থাকে, কার্য্যগুলিও সহজে সম্পন্ন হয়, কিন্তু আর একদিন কত চেষ্টাতেও সেরূপ ফল পাওয়া যায় না, কত প্রকার বাধা বিঘ্ন আসিয়া পড়ে। কি কারণে এইরূপ হয়, কিরূপে কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে, কি ভাবে কর্ম্মফলের বিধান হয়, দৈবের প্রভাবই বা কতটা আর পুরুষকারের ও সাধ্যের সীমানাই বা কোথায়—এই সব যতই বুঝিবার চেষ্টা করা যায় ততই উহা যেন আরও ঘোরতর রহস্যময় হইয়া দাঁড়ায়।

একটা বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে দৈব ইহ জন্মের ও পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফল। ঐ কর্ম্মফলের ভোগ লইতেই হইবে। বর্ত্তমানের যে কর্ম্ম ও পুরুষকার তাহারই অফলিত ফল ভবিষ্যতে দৈব বা অদৃষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। তবে এখনকার কর্ম্ম ও পুরুষকার দ্বারা দৈবের পরিবর্ত্তন করা যায় কিনা তাহা বলা কঠিন। কারণ একদিকে শুনি ঋষি মার্কণ্ডেয় সাধনার দ্বারা নিজের অল্প আয়ু অতি দীর্ঘ আয়ুতে পরিণত করিয়াছিলেন।

অন্যান্য সাধকেরাও নাকি তপ সাধনার দ্বারা কত অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু অপর দিকে দেখি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন "যাহা হইবার তাহা সব স্থির হইয়া আছে, এবং ঐ দেখ তাহা হইয়াও আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহাদের ধ্বংস হইবার তাহারা দেখ সব সেখানে পড়িয়া আছে। তুমি কি করিবে? তুমি নিমিত্ত মাত্র।" ব্যাসদেবও মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের পর বুঝাইয়াছেন "তুমি কেন বিলাপ করিতেছ, সমস্তই দৈব ও বিধির বিধান অনুযায়ীই হইয়াছে। তাহার অন্যথা হইবার ছিল না।"

সত্যই ত, নচেৎ ব্যাস, কৃষ্ণ, বিদুর, ভীষ্ম ইত্যাদি কাহারও চেষ্টায়, কাহারও বোঝানোয় দুর্যোধনের মতি ফিরিল না কেন? দৈব ও পুরুষকারের গভীর রহস্য জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত যেন আরও জটিল হইয়া ওঠে। আমার ইংরাজি As I Have Felt এবং Reflections and Reactions বইতে এই সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়াছি! এক অজানা মহাশক্তির ইচ্ছা বিনা আমার চেষ্টায় যে কিছু হয়না তাহা প্রত্যহই যেন বেশি করিয়া অনুভব করিতেছি।

কৈলাশ ও মানস সরোবর যাত্রার কথা মনে হইলেই এই সব কথা মনে আসে, কারণ ঐ যাত্রার সময় উহা বড় সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলাম।

৩

কৈলাশ দর্শনের বাসনা অনেকদিন হইতে অনেকবারই মনে জাগিয়াছে, কিন্তু উহা যে কিরূপে হইবে, কৈলাশ যাওয়া সম্ভবই হইবে কি না তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিনি। অথচ পথ সম্বন্ধে জানিবার জন্য আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনারকে কতবার চিঠিও লিখিয়াছি। প্রতিবার উত্তরও আসিয়াছে, কিন্তু যাওয়া হয়নি। পথ সুদূর, কঠিন, অজানাও। কেদার বদ্রীতে যেমন অসংখ্য লোক যায়, কৈলাশ মানস সরোবরে সেরূপ নয়। অতি অল্প যাত্রী যায় আর তাহাও দশ বারজন অন্ততঃ একত্র দলবদ্ধ হইয়া। আমরা মাত্র দুজন, মা ও আমি। কি করিয়া যাইব তাহা ভাবিতে গেলেই মনের মধ্যে যেন সাহসের অভাব বোধ হইত। অথচ ভয়ের যে কোন কারণ নাই তাহাও বুঝিতে পরিতাম, কারন যিনি প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা তিনি ত সর্ব্বত্রই আছেন। উঁহার উপর ভিন্ন আর কাহারও উপর ভরসা ও নির্ভর করা যে নিরর্থক তাহাও বুঝিতাম। লোকে যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ডাক্তার-বদ্যির উপর নির্ভর করে তাহা যে কেবল মোহ ও ভ্রান্তি বশতঃই করে ও তাহাতে যে কিছু হয় না, রক্ষা পায় না, ইহা জানিয়াও লোক উহাদেরই উপর ভরসা করে। যিনি সব ঘটনার বিধান কর্ত্তা, যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তাঁহার উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা রাখিতে পারি না বলিয়াই আমাদের যত ভয় ও দুঃশ্চিন্তা।

এইরূপ ভাবিয়া দেখা সত্ত্বেও মনের অস্থিরতা যায়নি। ইতিপূর্ব্বেও আমরা দুর্গম পার্ব্বত্য পথে গিয়াছি। সিমলা হইতে মশুরী জঙ্গলের পথে প্রায় ১৭০ মাইল মা, মাসিমা ও আমি এক গাড়ওয়ালি কুলি অমরসিংকে নিয়া গিয়াছি। মশুরী হইতে আরম্ভ করিয়া যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, বুড়োকেদার, পাঁওয়ালি, ত্রিযুগিনারায়ণ, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, বদ্রীনাথ হইয়া ঋষীকেশ পর্য্যন্ত সব হাঁটিয়া মা ও আমি গিয়াছি। কাশ্মিরে অমরনাথ দর্শনেও গিয়াছি। কিন্তু তবুও কৈলাশ মানস সরোবর যাইতে মন নিরুদ্বেগ হইতে ছিল না। ওখানকার পথ অবশ্য দুর্গম এবং ওপথে লোক ও যাত্রী চলাচলও খুব কম, কিন্তু তাছাড়া ঐ তীর্থ যাত্রার কথা যাঁহারই নিকট তুলিয়াছি তিনিই ভয় দেখাইয়াছেন ও নিরুৎসাহিত করিয়াছেন। এই ভয় দেখান ও নিরুৎসাহ করা আমাদের সকলেরই প্রায় অভ্যাসগত। পথ ছাড়া কোন পথে যেখানে একটু অনিশ্চয়তা আছে, একটু risk, adventure আছে, সে পথে কেহ যাইতে চাহিলে আমরা তাহাকে নানারূপ বিপদ, আশঙ্কার কথা বলিয়া ভয় দেখাই ও যাইতে নিষেধ করি। ইহাতে লোক দুর্ব্বলচিত্ত ও ভয়তরাষে হইয়া যায়। পথে ঘাটে কাহারও সহিত দেখা হইলে আমরা কোন ভাল ও উৎসাহের কথা বলি না। প্রথম সম্ভাষণ হয় এই বলিয়া—"আপনার চেহারা যেন একটু খারাপ দেখছি।" তার উত্তরে তিনি যতই না ভাল থাকুন কখনো বলিবেন না, "না, বেশ ভাল আছি।" বড় জোর এই বলিবেন "আর কোন রকমে কেটে যাচ্ছে" এবং তারপরই

"এই কেটে যাচ্ছে" বলার সঙ্গে যোগ করিবেন একটা না একটা শারীরিক অসুস্থতার কথা। ইংরাজদের মধ্যে সম্ভাষণ অন্যরূপ। "How do you do ?" কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে সে তখনি বলিবে "Fine." পেট্টা কেমন আছে, কয়বার উদ্গার হইয়াছে, রাত্রে কয়বার পাশ ফেরাফেরি করিয়াছে, ইত্যাদি একটা না একটা অস্বস্থি, অসুস্থতার বৃত্তান্ত উভয়ে উভয়কে শোনাইবে না। একজন আর একজনকে দেখিয়া প্রফুল্লভাবে বলিবে "You look very fit."। যাকে বলা হইবে সে সানন্দে compliment গ্রহণ করিবে। এইজন্য তাহারা সাহসী ও adventure প্রিয় হয়, এবং অন্যদেরও adventureএ উৎসাহ দেয়।

কৈলাশ সম্বন্ধে আমি যখনি আলমোড়ার ইংরাজ ডেপুটি কমিশনারকে লিখিয়াছি তখনি তিনি উত্তর দিয়াছেন। আমি যখন সিমলা হইতে মশুরি যাই তখন সিমলার ডেপুটি কমিশনার Mr. Crump কেবল যে আমাকে সব রকম advice, information ও help দিয়াছিলেন তাহা নয়, আমাকে উৎসাহও দিয়াছিলেন। যে adventure ভালবাসে সে adventureএ উৎসাহ দেয়। সিমলা হইতে মশুরীর পথে কোথায় কোথায় থাকিবার জায়গা তিনি সব বলিয়া দেন। পথ দুইটি Indian States এর ভিতর দিয়া খানিকটা গিয়া তারপর Dehra Dun এর Forest Department এর এলাকার ভিতর দিয়া গিয়াছে। সেখানে দশ বার মাইল

তফাতে Forest Rest House আছে যাহার জন্য Mr. Crump আমাকে Dehra Doon এর Conservator of forestsকে লিখিতে বলেন। ঐ দুই Indian States Theog ও Jubbal. ওখানেও আমার যাইবার প্রোগ্রাম পাঠাইতে বলেন। Jubbal থেকে উত্তর আসে, কিন্তু Theog থেকে আসেনি। সিমলায় Mr. Crump এর সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে তা বলায় তিনি তাঁহার head clerkকে ডেকে তখনি বলেন সিমলায় Theog House এ টেলিফোন করিয়া খবর লইতে যে কেন আমার চিঠির উত্তর যায়নি। Jubbal State এর ব্যবস্থা কিন্তু খুবই ভাল। জুব্বল সিমলা হইতে ৪৮ মাইল। আমরা যেদিন জুব্বল পৌঁছই জুব্বলের নিকট পথে মহারাজার একজন লোক আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি অতি সমাদরে আমাদের State Guest House এ লইয়া গেলেন। এত দূরে পাহাড়ের ভিতর এমন আধুনিক Guest House দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। তাহার চেয়েও বেশি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম মহারাজার আতিথ্যে। তাঁহার লোকটি যিনি আমাদের গেষ্ট হাউসে লইয়া গেলেন তিনি বলিলেন "আপনার জন্য খানা তৈরী আছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "খানা কি হবে, আমি ত সাহেব নয়, খাঁটি হিন্দু। আমরা ত রেঁধেই খাই। আমাদের সঙ্গে রাঁধবার সব জিনিষই আছে।"

তাহাতে তিনি বলিলেন "তা থাক্। আপনি আমাদের

state guest. আপনারা ক'জন, কি খান বলুন আমি সব পাঠিয়ে দেব।"

"তাহলে একটু চাল, একটু আটা, একটু ঘি, দুটো আলু, এই হলেই হবে।"

"আমি বুঝেছি" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং একটু পরে দুজন লোকের মাথায় দুই পরাতে করিয়া নানারকম জিনিষ লইয়া এলেন। সুজি, চিনি, মেওয়া, মশলা, দুধ, ঘি, তরি তরকারি কিছুই বাদ ছিল না। "এত কি হবে?" বলায় তিনি না শুনিয়া রাখিয়া গেলেন।

সিমলায় আমি কুলি পাচ্ছিলুম না, সিমলার কুলি জুব্বল পর্য্যন্ত যেতে রাজী ছিল, তার আগে নয়। সেজন্য আমি জুব্বলে লিখেছিলুম যে যদি সেখান থেকে মশুরী যাবার এক কুলি পাওয়া যায় ত ঠিক করিতে। সিমলা হইতে রওয়ানা হবার আগের দিন অমরসিংকে পেয়ে আমাদের কুলির সমস্যা মিটিয়া যায়। জুব্বলে পৌঁছিবার ক্ষাণিক পরেই মহারাজার ভাই Guest House-এ এলেন ও বলিলেন "আপনি কুলির জন্য লিখেছিলেন, কুলি ঠিক করেছি।"

আমি তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে আমি একজন কুলি মশুরী পর্য্যন্ত পেয়ে গেছি।

পরদিন সকালে মহারাজার palace হইতে একজন আসিয়া

আমাকে মহারাজার নিকট লইয়া গেলেন। মহারাজা অতি অমায়িক ও সুশিক্ষিত। আমার "spirit of adventure" দেখিয়া খুব খুশী। বলিলেন "এখানে ইউরোপিয়ানরাই আসে, ইণ্ডিয়ান আসে না, অথচ কত মনোরম দৃশ্য এই পথে রয়েছে।"

তিনি আর এক route দিয়ে আমাকে আবার আসিতে বলিলেন এবং নিজের হাতে আঁকা ঐ পথের একটা route map আমাকে দিলেন। আমি টেনিস খেলি জানিয়াও খুব খুশী। ওঁর Guest House এর পিছনে বেশ একটি lawn court ছিল। আমার সঙ্গে টেনিস র‍্যাকেট্‌ও ছিল। তিনি বলিলেন "আমার ত বয়স হয়েছে, আপনি আমার ছেলের সহিত টেনিস খেলুন।"

টেনিস খেলার জন্য আমি একদিন আরও জুব্বলে রইলুম, কিন্তু বৃষ্টির জন্য টেনিস খেলা হল না।

মহারাণীও খুব অমায়িক ও শিক্ষিতা। তিনি আমার মাকে ও মাসিমাকে প্রাসাদে লইয়া গিয়া অনেক কথাবার্ত্তা বলেন।

যেমন Mr. Crump ও জুব্বলের মহারাজা সাহায্য ও উৎসাহ দিয়াছিলেন সেইরকম আর একজনও দেন। তিনি ডেহরাডুনের Forest officer, নাম সঠিক মনে নেই, যেন মনে হচ্ছে Mr. Hakimuddin. তিনি আমার সিমলা হইতে লেখা চিঠি পাইয়া হিসাব করিয়া দেখেন যে ডাকে উত্তর পাঠাইলে

সিমলা হইতে রওয়ানা হইবার আগে আমি হয়ত তা পাব না। সেইজন্য তিনি এক Forest guardকে দিয়া Forest Rest Housesএ আমার থাকিবার permits পাঠান। Forest guard আমাকে চেনে না। পথে আমাদের আসিতে দেখিয়া অমরসিংকে জিজ্ঞাসা করে যে আমরা কোথা থেকে আসছি। আমরা সিমলা থেকে আসছি জানিয়া আমার নাম লেখা একখানা brown envelope আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি ত অবাক্। এই বনের মধ্যে আমার নামে চিঠি আসে কোথা থেকে। খুলে দেখি Forest office এর পাঠান permits. Mr. Hakimuddin কেবল ইহাই করেননি। জুব্বল থেকে বেরিয়ে আমাদের Tuni পৌঁছিবার কথা, কিন্তু সকালে বৃষ্টির জন্য জুব্বল থেকে রওয়ানা হইতে আমাদের একটু দেরি হয়ে যায় এবং তারপর বিকেলে আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছিলুম সেখানে ভাল্লুকের ভয় ছিল বলিয়া আমরা সন্ধ্যার আগেই একটা ছোট্ট দোকানে থেকে যাই এবং দোকান ঘরের ভিতর জায়গা না থাকায় দোকানের বাহিরে একরকম বসিয়াই রাত কাটাই।

পরদিন যখন Tuni পৌঁছলুম তখন দূর থেকে দেখি Forest bungalowর সামনে একটা পোষা কুকুর বেড়াচ্ছে। তাহলে কেউ এসেছে। এগিয়ে গিয়ে শুনলুম Forest officer Mr. Hakimuddinই এসেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন "আসুন, আপনার ত এখানে গতকাল

আসিবার কথা ছিল, সেইজন্য আমি কাল এখানে না এসে অন্যত্র ছিলুম।”

আমি বললুম “হ্যাঁ, কালই আসবার কথা ছিল তবে জুব্বলে একদিন বেশি থাকা হয়ে যাওয়ায় কাল আসা হয়নি।”

তিনি বলিলেন “তাতে কি হয়েছে, আসুন,” এই বলিয়া নিজের জিনিষপত্র একখানা ঘরে নিয়ে গেলেন ও আমাদের জন্য দুখানা ঘর ছেড়ে দিলেন। আমি বললুম “আমাদের একখানা ঘরেই যথেষ্ট হবে।” কিন্তু তিনি শুনিলেন না, নিজে একখানা ঘরে গিয়া আমাদের জন্য দুখানা ঘর ছাড়িয়া দিলেন।

পথছাড়া পথে গেলে ভয় না দেখাইয়া সাহস ও উৎসাহ দিলে মনে কত বল আসে তা বলিবার জন্যই উপরের ঘটনার উল্লেখ করলুম। ঐ যাত্রায় যাঁহারা সাহস ও উৎসাহ দিয়াছিলেন ও যথাসম্ভবের বেশি সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা কখনই ভুলিতে পারি না। পথ ছাড়া পথে না গেলে এরূপ চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতাও হয় না, আর এই রকম সত্যকার মানুষও দেখা যায় না, তাঁহাদের পরিচয়ও পাওয়া যায় না। অনেকবারই বনে জঙ্গলে বিদেশে এই রকম মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাঁহাদের কখন ভোলা যায় না, ও যাঁহারা দেখিয়ে দেন যখন মন অন্য প্রকার মানুষের ব্যবহারে ও আচরণে ক্লিষ্ট ও তিক্ত হয় যে অন্য প্রকার মানুষও সৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এইরকম এক জনের কথা আজ মনে হচ্ছে।

আমি ও আমার স্ত্রী সেবার প্রথম রূদ্রনাথ যাচ্ছি। সঙ্গে চলেছে আমাদের বোঝা নিয়ে বলবাহাদুর আর গাইড নারায়ণসিং। আমরা সেবার গোপেশ্বর থেকে চলেছি। আমরা যখন দশ হাজার ফুটের ওপরে তখন বৃষ্টি ও সেই সঙ্গে বরফ পড়তে আরম্ভ হল। একটা সেখানে গাছও নেই যে তার তলায় দাঁড়াই। আছে ঘাস ও চরে বেড়াচ্ছে দুই তিনশ ছাগল ভেড়া। আর ছিল একটি ছোট ঘাস পাতা দিয়ে তৈরি ঝোপড়া। ভেড়াওয়ালা তাইতে থাকে। তারা ছিল দুজন, বৃদ্ধ ভেড়াওয়ালা ও তার এক নাতি। কুটিরটি খুব ছোট, তার মধ্যে আবার কুড়ি পঁচিশটা ভেড়া ও ছাগল শাবক। মাঝখানে একটা কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে। বাকি স্থানটায় কোন রকমে ওরা দুজনে থাকে। বৃদ্ধ ভেড়াওয়ালা কিন্তু আমাদের বলিল "তোমরা ভেতরে যাও, আমরা ত পাহাড়ী, আমরা বাইরে থাকব।"

আমি বললুম "আমরা ছয় জনই ওর ভেতরে যাব।"

এই বলিয়া আমি তার হাত ধরিয়া টানিয়া ঝোপড়ার ভিতর ঢুকিলাম। ঘাস পাতার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, ওপর দিয়েও জলের ফোঁটা পড়ছে। সাড়ী কাপড়, plastic sheet দিয়া চারিদিক যথাসম্ভব ঢাকিয়া আমরা গুটিসুটি হয়ে ভিতরে বসলুম। আমার স্ত্রী ও বলবাহাদুর ঐ কাঠের গুঁড়ির উপর চাপাতি ও আলু বিনের তরকারি করলেন। ছজনের বেশ খাওয়া হল। খাওয়ার পর সকলকে বললুম এক একটা গল্প বলিতে।

আমিও হরিশচন্দ্রের গল্প বললুম। এই রকম গল্প শুনিতে শুনিতেই আমরা কাত হয়ে নিজে নিজের স্থানে ঘুমিয়ে পড়ি। বাহিরের দুর্যোগ পরে কম হইয়া গিয়াছিল। সেদিনকার রাত্রের অভিজ্ঞতা কখন ভোলা যায় না। A Night In Heaven কাহিনীতে ঐ বিষয় লিখিয়াছি। সত্যই সে রাত্রি a night in heaven এর চেয়েও সুখকর ছিল, কারণ স্বর্গে হয়ত অনেক প্রকার আরাম থাকিতে পারে কিন্তু এমন লোকের সঙ্গ কখনই পাওয়া যাইবে না, যে বরফে বৃষ্টিতে বাহিরে থাকিয়া নিজের ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর অজানা অপরিচিত আগন্তুকদের ছাড়িয়া দিবে।

পর্য্যটনে স্থানে স্থানে, পথে পথে, কতরকম অনুভব ও অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞানলাভ হয় তাহা শুনে বা বই পড়ে হয় না। শোনা বা পড়ায় প্রত্যক্ষ দেখা ও অনুভব নাই, সেইজন্য তাহাতে মনের উপর যে প্রভাব প্রত্যক্ষ দেখায় হয় সে প্রভাব হয়না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভবেই মনের কত প্রকার বিকার, সংস্কার ও মোহ কাটিয়া যায় যাহা মনকে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ করিয়া রাখে। মনের এই ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতাই মানুষের মানুষের মধ্যে সরল বোঝাপড়ার অন্তরায় হয় আর পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি, উদারতা ও সমবেদনার পরিবর্ত্তে হিংসা, দ্বেষ, অহংকার, ও স্বার্থপরতা আনিয়া দেয় যাহার জন্য আমার-পর, আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বদেশী-বিদেশী, ইত্যাদি নানা-প্রকার ভেদাভেদ ভাব আসে। অথচ যাহাদের আমরা আপনার লোক, ঘরের লোক, আত্মীয়-স্বজন বলি ও মনে করি তাহাদের

নিকট হইতে যেরূপ অশান্তি, দুঃখ ও মর্ম্মান্তিক বেদনা পাই, অনাত্মীয়, বিদেশী ও পথে পরিচিত লোকের নিকট হইতে সেরূপ পাইনা। যত ঝগড়া-ঝাঁটি, নালিশ-মকদ্দমা ঐ নিজের লোক ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেই। তবুও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আত্মীয়-স্বজনের মোহ মানুষের ভাঙ্গে না। চারটে দেয়ালের ভিতরই তার মোহ-মায়া, দেওয়া-নেওয়া আবদ্ধ রাখতে চায় যতই না তাহাতে ঐ ঘরের ভিতরের সম্বন্ধ তিক্ত ও বিষময় হোক্। স্নেহ ভালবাসা সহানুভূতি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেই দুষিত হয়, যেমন বাতাস ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে দুষিত হয়।

প্রথম যেবার যমুনোত্রী যাই, তখন সমস্তই পায়ে হাঁটা পথ ছিল। মশুরী হইতে যমুনোত্রীর পথ আরম্ভ। তখন ওপথে অল্প যাত্রীই যেত, এখনকার মত বাসে করে হাজারে হাজারে যাত্রী যেত না।

একটা ছোট চটিতে মা ও আমি রাত্রে শুয়েছি। চটিতে একধারে চটিওয়ালা ছিল অপর দিকে আমরা শুয়েছি। আমাদের কাছে কেহ নেই। বাহিরে অন্ধকার, চটির নিচেই পায়ে হাঁটা রাস্তা, তার নিচে যমুনা। ওপারে আকাশ জুড়ে কালো পাহাড়। সব নিস্তব্ধ, কেবল যমুনার গর্জ্জন ওপারের পাহাড় হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। আমি আর মা শুয়ে আছি। আমার ভয় করিতে লাগিল। উঠে একবার বাহিরে যাইবারও সাহস নেই। এমন সময় এক পাহাড়ী এল।

তখন চটিওয়ালা আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। লোকটী চটীতে আসিয়া আমার পাশেই শুইয়া পড়িল। তাহার বস্ত্র ছিন্ন, মলিন। অন্যত্র হইলে হয়ত বলতুম তাকে সরিয়া শুইতে কিংবা নিজেই সরে যেতুম ; কিন্তু সেদিন সে সময় তার সান্নিধ্যে মনে বল ও ভরসা এসেছিল। সেদিন বুঝেছিলুম আমার মত সেও মানুষ, কোন প্রভেদ নেই। বস্ত্র পরিচ্ছদ আমাদের ভাল মন্দ হইলেও ও আমার কিছু ধন-সম্পত্তি, টাকা পয়সা বেশি থাকিলেও তাকে পাশে পেয়ে মনে বল ও ভরসা পেলুম। ও যদি আমার কাছে আরও সরিয়া আসিত, আমাকে জড়াইয়া ধরিত তাহা হইলে আরও নিশ্চিন্ত হইতে পারতুম। যে অহংকার অন্য সময়, অন্য স্থানে, আমাকে ওর কাছ থেকে সরাইয়া রাখিত, তাকে আমার কাছে তুচ্ছ, নগণ্য ও অস্পৃশ্য করিত, সে অহংকার সেদিন সেখানকার নির্জ্জন অন্ধকারে আমার মন থেকে সরিয়া গিয়াছিল, তাই তখন বুঝেছিলুম আমরা দুজনেই মানুষ, সমান অসহায়, আমাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, আমাদের পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরতাতেই বল ভরসা আসে। বইতে এরকম কথা পড়িলেও বা অন্যের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিলেও এরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না হইলে সেদিন যে জ্ঞান হয়েছিল সে জ্ঞান হইত না।

পর্য্যটনেই এইরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হয় বলিয়াই, তীর্থ পর্য্যটনের মাহাত্ম এত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নৈমিষারণ্যে যখন একবার মুণি-ঋষিদের সভা বসিয়াছিল তখন

বলরাম আসিয়া দেখেন যে এক সূত সেই সভায় সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত। সূতের সভাপতির আসনে বসিবার ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলরাম তাঁহাকে বধ করেন। ঋষিরা বলরামকে বলিলেন "তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়াছে, ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তুমি তীর্থ পর্য্যটনে যাও।"

যে বিকার বশতঃ বলরাম সূতকে বধ করেন, সে রকম বিকার তীর্থ পর্য্যটনে চলিয়া যায়। মানুষে মানুষের মধ্যে ছোট বড়, উচ্চ নীচ ভাব ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ মানুষের মনে অজ্ঞানতা বশতঃ অহংকার ও মোহ থাকে, যখন জ্ঞান হয় তখন আর থাকে না।

৪

১৯৪১ সালে গ্রীষ্মের আরম্ভ হইতেই কৈলাশের আকর্ষণ তীব্র হইতে লাগিল। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই মন হিমালয়ের সঙ্কীর্ণ উঁচু নিচু, আঁকা বাঁকা পথে ছুটিয়া যাইত। শুধু তখন কেন এখনও প্রতিদিন সকালেই হিমালয়ের কোন না কোন স্থানে মন ঘুরিয়া বেড়ায় ও সেখানে যাইবার ইচ্ছা জাগিয়া ওঠে। ১৯৪১ সালে সে সময় কিছুদিন ধরিয়া আমার অর্শের কষ্ট ছিল। সকালের দিকে চলাফেরা করিতে কষ্ট ও জ্বালা এমন হইত যে একটু চলিলেই বসিতে হইত। এইখানেই যখন এত কষ্ট তখন কৈলাশে কি করিয়া যাইব, সেখানে ত দুইবেলা চলিতে

হইবে, আর তাও চোদ্দ পনের মাইল করিয়া অন্ততঃ। তবুও যাইবার জন্য লেখা-লেখি করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় কিন্তু এই যে কৈলাশের পথে অর্শের কষ্ট মোটেই পাইনি, একদিনও জ্বালা করেনি।

দেখিতে দেখিতে জুন মাস আসিল। আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনার লিখিয়াছিলেন জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কৈলাশ যাইবার প্রশস্ত সময়। কৈলাশের বিষয় একখানা বইতে আসকোটে একজন রাজবার সাহেবের কথা পড়িয়াছিলাম যিনি ঐ বইয়ের লেখককে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ওখানকার স্থানীয় জমিদার। তাঁহাকে আমাদের যাইবার প্রস্তাব লিখি। উত্তরে তিনি সৌহার্দ্দপুর্ণ চার পাতার এক চিঠিতে পথের বিষয় লিখিয়াছিলেন এবং আমি কবে নাগাদ আসকোটে পৌঁছিব তাহা জানাইতে লিখিয়াছিলেন।

জুন মাসের মাঝামাঝি হইল, বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। বৃষ্টিতে পাহাড়ে কি করিয়া যাইব ভাবিতে লাগিলাম। মার বৃষ্টিতে কষ্ট হয়, আমারও মনে অবসাদ আসে। তবে কৈলাশপতির বোধ হয় অনুগ্রহ হইয়াছিল। যাওয়া শেষে স্থিরই হইল, এবং আমরা ২৭শে জুন রওয়ানা হইলাম। এখন যে রকম আয়োজন করিয়া জিনিষপত্র লইয়া হিমালয় যাই সে হিসাবে তখন কিছুই নিইনি। কয়েকখানা করিয়া কাপড় জামা, একটা সোয়েটার, একটা মামুলি গরম কোট, একটা কম্বল ও মার হাতে সেলাই করা

বালাপোষ। মোটামুটি এই। গারবিয়াং এ গিয়া তাঁবু ও কম্বল ভাড়া নিই, কিন্তু তাহা তাকলাকোটে ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল। কেন, তাহা পরে বলিব।

৫

কলকাতা থেকে রওয়ানা হইয়া কাশীতে সকালে পৌঁছলুম। রাজঘাটে স্নানাদি রান্না খাওয়া করিয়া স্টেসনে গিয়া এগার-টার সময় Doon Expressএ উঠলুম। এই ভাবেই আমরা সারা ভারতবর্ষই ঘুরেছি। গাড়িতে মা জলও খেতেন না। সেজন্য আমরা সকাল বেলা একটা স্টেসনে নেবে পড়তুম। ছোট স্টেসন হলেই সুবিধে হত। সেখানে প্লাটফরমের এক ধারে বা স্টেসনের বাহিরে নিরিবিলি এক গাছতলায় জিনিষপত্র রাখিয়া প্রাতঃ-কৃত্যাদি, স্নান আহ্নিক, রান্না খাওয়া করিয়া আবার কোন গাড়িতে উঠে চলতুম। রান্না হত বেশির ভাগ খিচুড়ি। রাত্রে কোথাও থাকা হলে লুচি বা পরটা ও একটা কোন তরকারি হত। তীর্থ যাত্রায় আমরা তেল খেতুম না, তেল মাখতুমও না। যা কিছু ঘিয়ে রান্না হত। সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদ, জিনিষপত্র বিশেষ কিছু থাকত না, তবে দাবাবড়ে থাকত, ট্রেনে বা প্লাটফরমে বা ধর্ম্মশালায় মা ও আমি খেলতুম।

কাশীতে নাবলুম, রান্না-খাওয়া সবই করলুম অথচ বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করলুম না, সে জন্য মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল।

এগারটার গাড়িতে উঠিয়া আমরা বিকেল পাঁচটায় ফয়জাবাদে নাবলুম। এলাহাবাদে মাসিমা ছিলেন, তাঁকে ফয়জাবাদে আসিতে লিখেছিলুম আমাদের সঙ্গে ঐখান থেকে কৈলাশ যাইবার জন্য। মাসিমা মার ছোট বোন। মেশোমশায় ছিলেন না। মাসিমা কি করিয়া তীর্থে যাইবেন মনে হইত, তাই তাঁকে তীর্থে যাইবার সময় আসিতে লিখতুম। উনি ফয়াজাবাদে আসেন নি। কি করি ভাবিয়া ফয়জাবাদ থেকে ওঁকে আবার খবর পাঠালুম, কিন্তু উনি এলেন না। ওঁর মেয়ে লিখে পাঠাল ওঁর শরীর ভাল নেই। ফয়জাবাদে নাবার দরুণ আমরা দুদিন পেছিয়ে গেলুম।

ফয়জাবাদে উঠে আমরা বেরেলিতে গাড়ী বদল করে কাঠগুদাম সকালে পৌঁছলুম। ওখান থেকে মোটর বাসে করে ভাওয়ালি গেলুম। এখানে আমার বড়মামা ছিলেন। তাঁহাকে আমাদের আসবার কথা লিখেছিলুম, তিনি কিন্তু চিঠি পাননি। জিজ্ঞেস করে করে তাঁর ওখানে পৌঁছতে তিনি আমাদের দেখে অবাক্। তবে আমরা যে কৈলাশ যাচ্ছি তা শুনে কেবল আশ্চর্য্য নয় যেন একটু উৎকণ্ঠিতও হলেন। ওখানে সামনের একটা পাহাড় যেন শিবলিঙ্গের মত। ওখানকার লোকেরা উহাকে কৈলাশ বলে। বড়মামা বলিলেন "ঐ দেখ কৈলাশ। এইখান থেকেই কৈলাশ দর্শন কর"।

আমরা দুজন কৈলাশ যাচ্ছি সঙ্গে কেউ নেই, তাহাতে তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন। তবে তিনি নিজে অসীম

সাহসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমার মনে আছে অনেকদিন আগে একবার তিনি বড় অসুস্থ হন। তাঁহার সবল দেহ তখন এমনি ক্ষীণ হয়েছিল যে তাঁকে দেখে যেন চিন্তেই পারা যেত না। বেরেলি কলেজে তখন তিনি প্রোফেসার ছিলেন। অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়ে ভাওয়ালিতে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। সেই সময় একদিন বিকেলে বেরেলি থেকে দিদিমার অসুখের সংবাদ পান। যখন খবর পান তখন ভাওয়ালি থেকে কাঠগুদাম যাবার bus ছিল না। কাঠগুদাম থেকে সকাল ছটায় বেরেলির গাড়ী ছাড়ে। সেই গাড়ী ধরার জন্য তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে ভাওয়ালি থেকে হেঁটে সন্ধ্যার সময় রওয়ানা হন। তাঁহাকে এইভাবে একলা জঙ্গলের পথে রাত্রে যেতে লোকে নিষেধ করে। একজন সাহেব ও তাঁর স্ত্রী বলেন "তুমি কি পাগল যে এরূপ দুঃসাহসিকতা করছ।" কিন্তু তিনি এগিয়ে চলেন, এবং সকাল হবার আগেই কাঠগুদাম পৌছন ও বেরেলির গাড়ী ধরেন। বেরেলি গিয়ে যখন তিনি পায়ের বুট জুতো খোলেন তখন দেখেন যে ঐ সুদূর পথ হাঁটায় জুতোর ঘর্ষণে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। এর দুই তিন দিন পরে মা ও আমি বেরেলি আসি ও তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা ও পায়ের অবস্থা দেখি। তাঁহাকে কখন এমন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দখিনি। মার উপর এমন ভালবাসা, মার অসুখ শুনে এমন অসুস্থ অবস্থায় সারারাত পাহাড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একলা একটি লাঠি মাত্র নিয়ে সুদূর পথ চলে আসা, ইহা

যেন এক অবিশ্বাস্য গল্প কাহিনী। এমন মাতৃভক্তি, এমন মায়ের উপর ভালবাসা বড়ই বিরল। মার কাছে শুনেছি যে দশমীর শেষরাত্রে বড়মামার কখন ভুল হইত না দিদিমাকে জাগিয়ে জল খাওয়াইতে যাহাতে তাঁহার পরদিন নির্জলা একাদশীর তীব্রতা কিছু কম লাগে। এবং দ্বাদশীর দিনও অতি প্রত্যুষে উঠে শুদ্ধ-শুচি হয়ে একাদশীর পারণের জলযোগের পরিপাটি ব্যবস্থা স্বহস্তে করিতে তাঁহার কখন ত্রুটি বা ভুল হইত না। এইরূপ দৃষ্টান্ত এতই বিরল যে এখানে তার উল্লেখ করা অবান্তর মনে করলুম না।

৬

পরদিন সকালে ভাওয়ালি থেকে busএ করে আলমোড়া রওয়ানা হলুম। বড়মামা বাসে তুলে দিতে এসেছিলেন। বাস ছাড়ল, তিনি বাহিরে দাঁড়িয়েছিলেন, মা ও আমি সুদূর অজানা পথে পাড়ি দিলুম। মন একটু চঞ্চল, চিন্তান্বিত, কিন্তু বাস যেমন পাহাড়ের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিল চোখ ও মন হিমালয়ের চির নূতন দৃশ্যের দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিল।

আলমোড়া পৌঁছে সেখানে থাকিবার সুবিধামত স্থান না দেখে আলমোড়া থেকে ক্ষাণিকটা এগিয়ে থাকব মনে করলুম। কিন্তু কুলির বন্দোবস্ত করতে হবে। বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে

একটি মন্দির ছিল, এখনও আছে, সেখানে মাকে বসিয়ে ও জিনিষপত্র রেখে আমি কুলির চেষ্টায় গেলুম। কৈলাশের পথ দুর্গম ও নির্জ্জন, লোক চলাচল খুব অল্প, কেদার বদ্রীর পথের মত নয়, সেজন্য সরকারি কুলি এজেণ্টের মারফৎ কুলি নেওয়াই ভাল মনে করলুম। অনুসন্ধান করে এজেণ্টের কাছে গেলুম, কিন্তু ১৯৪১ সাল, মহাযুদ্ধ চলছে, কুলি মজুর সব মিলিটারিতে ভর্ত্তি হয়েছে ও হচ্ছে, সেজন্য ঠিকেদার বলিল কুলি নেই। তাছাড়া আসকোটের নিকট কলেরার আবির্ভাবের খবর এসেছে সেজন্যও কেহ ওদিকে যেতে রাজী নয়। বাজারে গেলুম। সেখানেও কয়েকজন দোকানদার কুলি এজেন্সির কাজ করে। তাহারাও কেহ কুলি দিতে পারিল না। ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার পর যখন মার কাছে মন্দিরে এলুম তখন শুনলুম মাকে একজন বলে গেছে যে পথে কলেরা হচ্ছে, আমরা অগ্রসর হলেও হয়ত পথ থেকে গভর্ণমেণ্ট আমাদের ফিরিয়ে দেবে। শুনে চিন্তিত হলুম কিন্তু অগ্রসর না হয়ে ফেরবার কথা মনে স্থান দিতে পারলুম না। কেহ কেহ আবার আশার কথাও বলিল। কলেরা কমে গেছে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু কুলিও ঠিক হয়নি আর সেদিন অগ্রসর হবার সময়ও নেই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মন্দিরের পাশে আমরা রান্নার জোগাড়ে বসলুম। খাওয়ার পর মন্দিরের সামনেই শোবার ব্যবস্থা হল।

এই মন্দিরে কোন পুজারী ছিল না। ছিল এক অন্ধ বৃদ্ধ। সে সাত বছর এই মন্দিরেই আছে। বড় আশ্চর্য্য

হলুম। মানুষ কত রকমে, কত ভাবেই না দিন কাটায়। এই লোকটি বৃদ্ধ, অন্ধ, নির্ধন, নিঃসঙ্গ, নিঃসহায়, সাত বৎসর পাহাড়ে শীত বর্ষায় এই ক্ষুদ্র মন্দিরে আছে। চারিদিক খোলা, মাত্র উপরে একটু আচ্ছাদন। এইখানে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অতিবাহিত করে সে নিজের কর্ম্মফল শেষ করছে। অথচ তাহার ভাবে কোন আক্ষেপ, কোন নিরানন্দের লক্ষণ নেই। এইখানে বসে বসেই যাহা দানভিক্ষা পায় তাহাতেই নিজের আকাঙ্খা মেটায়। দু'বেলা কোথাও না কোথাও থেকে রুটি পায়, এবং যা কিছু পয়সা টয়সা পায় তাই দিয়ে চা-বিড়িও আনিয়ে নেয়। যাহারা আজীবন সংসারের মধ্যেই আছে, যাহাদের কখন নীলাকাশের তলায় আত্মীয়-স্বজন ছাড়া, অর্থহীন, ভরসাহীন, উদ্দেশ্য-বিহিন জীবন যাপন করিতে হয়নি তাহাদের এই মন্দির-দ্বারে অবস্থিত অন্ধ বৃদ্ধের অবস্থা ও জীবন বোঝা সম্ভব নহে।

এই অন্ধের নিকটেই একটু স্থানে আমাদের জিনিষপত্র যথাসম্ভব নিরাপদ করার জন্য বিছানার ভিতর ও আশে পাশে রেখে মন্দির দ্বারে আমরা শুয়ে পড়লুম। এইভাবে খোলা জায়গায় জিনিষপত্র নিয়ে নিদ্রা যাওয়া আমাদের এই প্রথম নয়। ইতিপূর্ব্বে কতবার কতস্থানে, মাঠে-বনে, ষ্টেসন-প্লাট্‌ফরমে, চটিতে ধর্ম্মশালায় মা ও আমি রাত কাটিয়েছি। এবারও আরো কতবার কত স্থানে এইভাবে কাটাতে হবে জেনে প্রস্তুত হয়ে এসেছি। সেইজন্য আজকে মনে কোন শঙ্কা, উদ্বেগ এল না।

প্রত্যুষে উঠে আমি আবার কুলির সন্ধানে বাহির হলুম। মিলিটারিতে যারা ভর্ত্তি হয়েছে তারা ছাড়া এখানে যে সব কুলি ছিল তারা এখানেই জিনিষ বহিবার কাজে ছিল, আলমোড়ার বাহিরে তারা যেতে চায় না। আলমোড়া থেকে কৈলাশ মানস সরোবর পর্য্যন্ত যাইবার কুলি আলমোড়ায় এমনিতেই পাওয়া যায় না। এখানকার কুলিরা ধারচুলা পর্য্যন্তই সাধারণতঃ যায়, ধারচুলা থেকে উঁচু পাহাড়ে যাবার কুলি সেখান থেকে নিতে হয়। তাহাও গারবিয়াং পর্য্যন্ত। গারবিয়াং থেকে ঘোড়া, খচ্চড়, জব্বু বা তিব্বতি কুলি নিয়ে তিব্বতে যেতে হয়।

আলমোড়ার বাজারে কুলির জন্য প্রায় বেলা আটটা পর্য্যন্ত ঘুরে মন্দিরে ফিরে এসে দেখি মার কাছে এক কুলি বসে আছে। মা বললেন এক দোকানদার একে এনে বলে গিয়েছে যে এ আসকোট পর্য্যন্ত যাবে। কুলিকে সঙ্গে নিয়ে আমি তখনি সেই দোকানদারের কাছে গেলুম। দোকানদার বললে "কাল আপনি কুলির কথা বলে গিয়েছিলেন, এই লোকটি আসকোট পর্য্যন্ত যেতে রাজী আছে। আসকোট পর্য্যন্ত যেতে পাঁচ টাকা চায়।" আমি তখনি রাজী হয়ে কুলিকে নিয়ে এলুম। দোকানদারও আমার সঙ্গে এল এবং আমাদের জিনিষপত্র গুছিয়ে বেঁধে নিতে সাহায্য করিল। মন্দিরে প্রণাম করে আমরা রওয়ানা হলুম।

আলমোড়া থেকে খানিকটা নাবাই পথ তারপর অল্প খানিকটা চড়াই। মাইল দুয়েক পরে একটা জলের বাউড়ি। বাউড়ি এক ছোট চৌবাচ্ছার মত, তলা দিয়ে জল ওঠে। আমরা এইখানে স্নানাদি সেরে কিছু খেয়ে নিলুম। জায়গাটি ভারি মনোরম, চারিদিকে পাইন গাছ। আমাদের এগোতে হবে তা না হলে এখানে থাকতে পারতুম। আরও মাইল দুয়েক গিয়ে চিতাই। এখানে কয়েকটি দোকান এবং একটি প্রাথমিক স্কুল ঘর ছিল। স্কুল ঘর তখন বন্ধ। আমরা ঘরের সামনে বারাণ্ডায় আশ্রয় নিলুম। সামনেই একটা জলের tank। তাতে জলের বেশ সুবিধে হল। রান্না খাওয়া সারতে রাত হয়ে গেল। সমস্ত দিনের পরিশ্রান্তি, খাওয়ার পরেই শুয়ে পড়লুম। কুলিও আমাদের পাশে শুল।

শেষ রাত্রে হঠাৎ পেটে এমন জোর বেগ এল যে উঠে একটু দূরে গিয়ে বসবার আগেই বেসামাল হয়ে পড়লুম। কাপড় কেচে আসতে না আসতেই আবার বেগ। সকাল হবার আগেই এরকম ক'বার হওয়াতে ভাবতে লাগলুম যে কি করে অগ্রসর হব কিন্তু অগ্রসর না হয়েই বা কি করব। ক্ষাণিক পরে স্কুল বসবে, আমাদের সরতে হবে। উঠে রওয়ানা হলুম। এখান থেকে বারিচীনা চার মাইল। এই পথ যেতে আবার বেগ আসায় মাঝে মাঝে পথে বসতে হয়েছে।

বারিচীনায় পৌঁছে ওখানকার স্কুল কোথায় জিজ্ঞেস করে জানলুম পথ থেকে একটু উপরে উঠে স্কুল। আমি একটা দোকানের সামনে বসে পড়ে একটা কাগজে স্কুলের মাস্টারকে লিখে পাঠালুম যে আমরা স্কুলে থাকতে পারি কিনা। কুলি আমার লেখা কাগজ ফিরিয়ে এনে বললে স্কুলের মাস্টার ইংরাজি লেখা পড়তে পারে না। আমি তখন হিন্দিতে লিখে আবার কুলিকে পাঠালুম। এবার মাস্টারটি আমার লেখা কাগজ হাতে নিয়ে নিজেই নেবে এলেন এবং বললেন হেডমাস্টার নেই এবং তাঁহার গ্রামও মাইল দুয়েক তফাতে। আমি বললুম যে হেডমাস্টার মহাশয় আমাদের থাকায় কিছু বলবেন না, আমি তাঁহাকে বুঝিয়ে বলব। আমাদের এক পাশে থাকায় স্কুলে কোন ব্যাঘাতও হবে না। মাস্টারটি রাজী হলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে উপরে স্কুলে গেলুম। স্কুলবাড়ী না পেলে এখানে আমাদের বড়ই অসুবিধা হত, কারণ স্কুল পাহাড়ের উপর ফাঁকা নির্জ্জন স্থানে ছিল বলে আমাদের বারবার মাঠে যাওয়ার অসুবিধা হয়নি। স্কুলের তখন ছুটি হয়ে গেছে। আমরা স্কুল ঘরের সামনের বারাণ্ডার এক ধারে জিনিষপত্র রেখে বসলুম। স্কুলে তিনখানি ঘর, একটা store এর মত তাতে জিনিষপত্র ছিল, মাঝের ঘরটায় পড়ান হয়, আর অপর ঘরে হেডমাস্টার থাকেন। মাস্টারটি রাত্রে আমাদের মাঝের ঘরে থাকতে বলে গেলেন।

বারিচীনায় জলের অভাব, প্রায় দেড়ফারলং থেকে জল আনতে হয়। এক দোকানদার আমাদের জন্য এক টিন জল

আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিল। একটিন জলের জন্য দু আনা দিতে হত। আমি এসে শুয়ে পড়লুম, তখন আমার একটু জ্বরও ফুটে এসেছে। পেটের অবস্থাও খুব খারাপ। বার বার মাঠে ছুটাছুটি করতে হচ্ছে। বেশ জোর রক্ত-আমাশা। মারও রক্ত-আমাশা দেখা দিল। দুজনেই কিছু খেলুম না, কেবল এক ফোঁটা করে Merc Cor দুজনেই নিলুম। রাত্রে মাঝের ঘরে যেখানে মাস্টারটি বলে গিয়েছিলেন তার ভিতর গিয়ে শুলুম। ঘরের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একরকম উড়ো পোকা নাকে মুখে ভ্রুর মধ্যে ঢুকে এমন বিরক্ত করতে লাগল যে ঘুম হয় না। পোকাগুলি এত ছোট যে ধরা যায় না। এবং এত অসংখ্য যে নিবারণ করাও অসম্ভব। পাহাড়ে এরকম পোকা আগে দেখিনি। পিশুই দেখেছি। পিশুর কামড় হতে রক্ষা পাবার কতরকম চেষ্টা করেও ফল পাইনি। সরষের তেল, হলুদ, কর্পূর ইত্যাদি গায়ে মেখে, সিদ্দির পাতা বিছানায় ছড়িয়ে, কিছুতেই ক্ষুদ্র পিশুকে এড়াইতে পারিনি। পরে হিমালয়ে অন্য যাত্রায় gamaksin ব্যবহারেও কিছু হয়নি।

সকাল হল, রক্ত-আমাশা বেশ জোরই রয়েছে, জ্বরও বেশ। আমার মত রক্ত-আমাশা অত জোর না হলেও মার পেটের অবস্থাও খারাপ, তবে মার জ্বর হয়নি। কুলিকে ডেকে বললুম আমাদের অসুখ, আজ যাওয়া হবে না। সে তাতে অসন্তুষ্ট হল, কারণ তার ইচ্ছা আমাদের তাড়াতাড়ি

আসকোটে পৌঁছে দিয়ে আলমোড়া ফিরে যায় ও অন্য কাজ নেয় বা মিলিটারিতে ভরতি হয়।

দ্বিতীয় দিনও আমাদের অগ্রসর হতে অক্ষম দেখে সে ব্যস্ত হল, তখন আমি তাকে হিসেব মিটিয়ে ছেড়ে দিলুম। বিষন্ন মনে ভাবতে লাগলুম কৈলাশপতি কি দর্শন দেবেন না! এখান থেকেও কি ফিরতে হবে। কতবার চেষ্টা করেছি, এবার এতখানি এসে পড়েছি, এখান থেকেও কি আর আগে যাওয়া হবে না। কাঠগুদামের নিচে হালদোয়ানিকেই এখানকার লোকেরা কৈলাশের দরওয়াজা অর্থাৎ দ্বার বলে। সেই দ্বার পার হয়ে এতটা আসাও কি বৃথা হবে। বড়মামার কথাও মনে হল। তিনি ভাওয়ালিতে বলেছিলেন এইখানেই থাক, কৈলাশে কোথায় যাবে। তাঁহার সেই টোকা কথা মনে খচ্ করে উঠ্ল। আমরা মোটে আলমোড়া থেকে আঠ মাইল এসেছি, সমস্ত পথই সামনে পড়ে রয়েছে। তাছাড়া যতটা এসেছি সেটা ত কিছুই নয়, সামনের পথই ত কঠিন ও দুর্গম। যদি শীঘ্র সেরেও উঠি তবুও এইরূপ রক্ত-আমাশা জ্বরের পর কতদিনে সামনের সুদূর পথ চলিবার শক্তি আসবে তাও জানি না। প্রায় পাঁচশত মাইল চলিবার রয়েছে, ষোল হাজার সাড়ে সাতশ ফুট উঁচু লিপু পাস পার হতে হবে, এবং সাড়ে আঠারো হাজার ফুটের উপর দিয়ে কৈলাশ প্রদক্ষিণ করতে হবে। কোথা হতে, কি করে, কতদিনে সে শক্তি আসবে? রাত্রে স্কুলের বারাণ্ডায় পাথরের মেঝের উপর সামান্য বিছানায় শুয়ে

মা ও আমি এই চিন্তাই করছিলুম। কি করে অগ্রসর হব ভেবে পাচ্ছিলুম না, অথচ এখান থেকে ফিরতে মন কিছুতেই চাচ্ছিল না।

এই ভাবে রাত কাটল। সকালে শরীর যেন অনেকটা সুস্থ বোধ হল এবং মনেও কিছু বল এল। মাকে বললুম মা আমরা অগ্রসরই হব। উভয়ের মনেই বোধ হয় তখন একই রকম প্রেরণা এসেছিল। নিচে থেকে দোকানদারের লোক যখন জল নিয়ে এল তাকে দোকানদারকে একবার পাঠাতে বললুম। দোকানদার এলে তাকে বললুম একটা কুলি ঠিক করে দিতে কাল আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য। ক্ষাণিকপরে সে একজনকে নিয়ে এসে বলল "এই লোক তোমাদের বোঝা নিয়ে যাবে, রোজ চোদ্দ আনা নেবে।" আমি বললুম "কাল সকালেই যেন এ আসে।"

কাল রওয়ানা হবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হবার কিছুই ছিল না, কারণ বোচকা-বুচকি নিয়ে আমরা পথিক হয়েই আছি, কেবল কাল কতটা কি রকম হাঁটতে পারব তাই ভাবছিলুম। অন্যদিনের মত সকালে স্কুল বসিল, তারপর স্কুল ভাঙ্গলে মা বললেন "আজ একটু ভাত করি, দুদিন ত কিছু খাওয়া হয়নি।"

পরদিন সকালে উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে রাত্রে করা দু'একখানা পুরি খেয়ে রওয়না হলুম। তিনদিন এখানে আটকে থাকার পর আজ পথে বেরিয়ে বেশ ভাল লাগল। পথ সোজা, চড়াই নাবাই অল্পই। চার মাইলে ধাওলচীনা। এখানে একটা ধর্ম্মশালার মত আছে, জলও আছে। এখানকার জল শুনলুম খুব ভাল। এখান থেকে মাইল দেড়েক চড়াই, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বড় সুন্দর পথ। চড়াইয়ের উপরে ছোট এক গ্রাম, তারপর পথ নেবে গেছে। আমরা বেশ ক্ষানিকটা নেবে গেছি কিন্তু কুলিকে না দেখতে পেয়ে একটা পাথরের উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু তার দেখা নেই। ভাবলুম হয়ত আমাদের অপেক্ষায় সে পিছনে কোথাও বসে আছে। এই ভেবে মাকে এখানে বসিয়ে আমি ফিরে গেলুম ওপরে গ্রাম পর্য্যন্ত, কিন্তু সেখানেও তাকে না দেখে লোকেদের জিজ্ঞেস করায় তারা বলিল সে পিছনে নেই এগিয়ে গেছে। তখন আবার এগলুম। পথে একজনকে সামনে থেকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করায় সে বলিল এক কুলিকে সে পিছনে বসে থাকতে দেখেছে। শুনে জোরে এগিয়ে চললুম। মার কাছে এসে বললুম কুলি আগেই গেছে। ক্ষাণিকটা যাবার পর দেখলুম সে পথের ধারে একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে। সে বলিল সে পগ্‌দণ্ডি ধরে এখানে অনেকক্ষণ এসে পৌঁছেচে।

একত্র হয়ে এগিয়ে চললুম। সামনে একটা গ্রাম, এখানে দুইটি দোকান, একটীতে গিয়ে উঠলুম। এখানে জল নেই, একটু নিচে একটা জলের ধারা, সেখান থেকে আনতে হয়। যা হোক আমরা এখানে রান্না খাওয়া করে এগিয়ে পড়লুম। পথ নেবেই চলেছে, দু-পাশে খোলা বিস্তৃত পাহাড়। তিন মাইল পর একটি নদী। পার হয়ে এক মাইল উঠে কানারি-চীনা। এখানে Forest Rest House ও স্কুল আছে। বেশ বড় গ্রাম। পথ ওপারে একটু নেবে, একটা ছোট নদী পার হয়ে আর এক পাহাড়ের উপর উঠেছে। উপর হইতে দুই-দিককার দৃশ্য অতি মনোরম। সূর্য্যাস্তের আরক্তিম আভায় আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রকৃতির এইরূপ বিরাট সৌন্দর্য্যের মধ্যে দাঁড়াইলে আমাদের ঘরের কোনের কৃত্রিম আসবাবপত্র সাজ শয্যা কতই তুচ্ছ, কতই নগণ্য, কতই যেন বিকট মনে হয়। অথচ কিন্তু ঐ সাজ শয্যায় আমাদের মন এতই পড়ে থাকে যে উহা ছেড়ে আমরা প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে আসতে চাই না। সামনে একের পর এক অসংখ্য পর্ব্বতমালা, যেন তাহার অবধি নাই। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে গ্রামের নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি ছোট ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে সেই পাহাড়ের দুইদিকেই নিচে আঁকা বাঁকা নদীর ধারা বয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা ঘর করে বা তাঁবু খাটিয়ে থাকলে কি রকম হয়। একবার রুদ্রনাথ থেকে মণ্ডলের পথে নাবার সময় কয়েকটি স্থান এমনি ভাল লেগেছিল যে

সেখানে তাঁবু খাটিয়ে থাকবার ইচ্ছে হয়। আমার স্ত্রী সেজন্য নিজের হাতেই এক তাঁবু তৈরী করেন, এবং এই তাঁবু আমাদের বেশ কাজও দিয়েছে। তুঙ্গনাথের নিচে চোপাতায় একবার এই তাঁবু খাটিয়ে আমরা এমন আরামে ছিলুম যে আবার সেইজন্য চোপতায় যাইবার ইচ্ছা হয় ও আছে। তৃতীয়বার রুদ্রনাথের পথেও এক অতি মনোরম স্থানে আমরা এই তাঁবু খাটাই।

এখানে কিন্তু দাঁড়িয়ে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার তখন সময় ছিল না। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার হবে, তার আগেই আমাদের কোন আশ্রয়ে পৌঁছতে হবে। নেবে চললুম, একেবারে নদী পর্য্যন্ত। এই সরযু নদী যাহার উপর রামের অযোধ্যা। পুল পার হয়ে ওপারে সেরেঘাট। এখানে বেশ কতকগুলি দোকান ও বসবাস আছে। একটি দোকানের উপরে আড্ডা নিলুম। আজ আমাদের ষোল মাইলের চেয়ে বেশী চলা হয়েছে। কুলিকে খুঁজতে যাওয়ার জন্য পিছনে যাওয়া আসায় আমার আরও মাইল দুয়েক বেশি হয়েছে। তিন দিন জ্বর রক্ত-আমাশার পর প্রথমদিন এত চলার শক্তি যে কি করে কোথা থেকে এল জানিনা। একি কৈলাশপতির দেওয়া শক্তি!

সেরেঘাট আমার বেশ ভাল লেগেছিল। আবার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয়। এখানে না ঠাণ্ডা না গরম। প্রশস্ত নদী। স্নান করিয়া মন ভরে না। নদীতে মাছও খুব। জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছে। এখান থেকে প্রায় দুই মাইল পথ ক্রমশঃ চড়াই, তাহার পর পাহাড়ের অপরদিকে একটা ছোট নদী পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছে। রোদের উত্তাপে হাঁটতে একটু কষ্ট হচ্ছিল তবে পাইন গাছের ছায়াও মাঝে মাঝে ছিল। এক বিস্তৃত পাহাড়ের ঘের ঘুরে পথ নদীর ধার দিয়ে চলেছে। আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে বেলা বারটা বেজে গেল। জায়গাটির নাম গনাই। এটি বেশ বড় জায়গা, পোষ্ট অফিস, কয়েকখানা কাপড়ের দোকান, এবং আসে পাশে বেশ চাষবাস ও বসবাস আছে।

রান্না-খাওয়া বিশ্রামের পর কুলিকে প্রস্তুত হতে বললুম, কিন্তু সে বলিল যে আজ আর সে চলিবে না, "তোমরা বড় বেশি বেশি চলিতেছ, কাল ষোল মাইল এসেছ। এক পড়াও করে চলবার নিয়ম, তার বেশি আমি যাব না।"

পথে মাঝে মাঝে দোকান ও পথিকদের থাকবার স্থান থাকে তাকে পড়াও বলে। প্রায় দশ দশ মাইলে এরকম পড়াও থাকে। আমি তাকে বললুম "তোমার সঙ্গে ত পড়াও পড়াও চলবার কথা হয়নি, তাছাড়া আমার মা যতটা চলতে পারেন তোমার

জন্য তা বেশি হতে পারে না।” কিন্তু সে কিছুতেই আর চলিতে চাহিল না। তাকে পয়সা দিয়ে ছেড়ে দিলুম। কাজেই এ বেলা আর আমাদের চলা হল না। অন্য কুলির চেষ্টা করতে হল। P. W. D. র. পথ মেরামতের এক Overseer এখানে ছিলেন। তিনি কয়েক জন ডোটিয়ালকে যেতে দেখে তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তাদের মধ্যে কেউ আমাদের বোঝা নিয়ে যাবে কি না। ডোটিয়ালরা এই দিককার উঁচু পাহাড়ের অধিবাসী। একজন রাজী হল, কিন্তু সে আজ এখানেই থাকবে কাল সকালে যাবে। এই বলে সে সঙ্গীদের সঙ্গে কাছেই কোথায় গেল। সকালে সে আসবে কি না চিন্তা রইল, কিন্তু উপায় কি? সেদিন ওখানেই থেকে যেতে হল।

সে কিন্তু সকালে ঠিকই এল ও আমাদের জিনিষপত্র বেঁধে নিয়ে সঙ্গে চলল। পাইন বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা অতি চিত্তাকর্ষক। কয়েক ঘণ্টা চলার পর বেরিনাগ পাহাড়ের নিচে এসে পড়লুম। এবার চড়াই। একটু উঠতেই কুলিটা বোঝা মাটিতে রেখে বলিল সে চলে যাবে। রাত্রে তার সঙ্গীদের মধ্যে কেহ তাহার পাঁচ টাকা চুরি করেছে, সে ছুটে গিয়ে ঐ সঙ্গীকে ধরবে। মহা মুস্কিল, সে এখানে বোঝা রেখে চলে গেলে আমরা কি করব? এখানে আর কোন কুলি পাব না। কুলি কেন, এখানে লোকজনও চলছে না। তাকে বললুম সে কি কথা, এখানে বনের মধ্যে

বোঝা রেখে চলে গেলে আমরা কি করে যাব? কিন্তু সে প্রস্থানোদ্যত। তখন ধমকের স্বরে বললুম যে বোঝা ছেড়ে গেলে তাকে বেরিনাগে পুলিসে ধরিয়ে দেব। সে বোঝা তুলে নিল। আমি তার পাশে পাশে পগ্‌দণ্ডি ধরে চললুম। মাকে রাস্তা ধরে চলতে বললুম। বেরিনাগ এখান থেকে এক মাইল। সবটাই চড়াই। বেরিনাগে পৌঁছে একটা দোকানের সামনে এসে কুলিটা বোঝা রাখল। দোকানদারকে আমি সব কথা বললুম। সে বলিল একে ছেড়েদিন আমি অন্য কুলি ঠিক করে দেব।

বেরিনাগ বেশ বড় জায়গা, এখানকার জল খুব ভাল। চা বাগান আছে, দোকান-পসারও আছে। খৃস্টান মিশনারীদেরও বেশ প্রভাব। এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে সরল অনভিজ্ঞ অধিবাসীদের তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের সমাজ, ধর্ম্ম, আচার-বিচার থেকে বিচ্ছিন্ন করে খৃষ্টান ধর্ম্মে নিতে এই মিশনারীদের বিশেষ চেষ্টা। ধর্ম্মের নামে ও ধর্ম্ম প্রচারের ফলে জগতে যে কত অনিষ্ঠ হয়েছে ও হচ্ছে, তাহাতে যে কত দুঃখ অশান্তি ছড়িয়েছে তাহার ঠিক নেই। যে যে ধারায়, যে সমাজের আবহাওয়ায় জন্মায় তাহাতেই তাহার স্ফুর্ত্তি ও বিকাশ সহজ ও সম্ভব। কাহাকেও তাহার ধর্ম্ম থেকে নিজের ধর্ম্মে আনা হিন্দুদের মধ্যে প্রশস্ত ছিল না। কিন্তু এখন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে হিন্দুর সংখ্যা বাড়াবার। এই আন্দোলন রাজনীতি প্রনোদিত, কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে গেলে যে হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের কি ক্ষতি হইবে তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিৎ। যাহাদের ধর্ম্ম-সংস্কার, মনোভাব, রীতি-নীতি অন্যরূপ তাহাদের নিজের গড়ের ভিতর আনিলে গড়ের ভিতর অমিল বশতঃ ভাঙনই আরম্ভ হয়। এইরূপ করা হয়নি বলেই এতদিন কত ঘাত প্রতিঘাত ও আক্রমণ সত্ত্বেও হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ সবল ও সতেজ রয়েছে।

৭

দোকানদার এক কুলির সঙ্গে কথা কয়ে তাকে ঠিক করে দিল আমাদের সঙ্গে আসকোট পর্য্যন্ত যাবে। আমি তাকে আমাদের কাছে ধর্ম্মশালায় রাত্রে থাকতে বললুম যাতে ভোর বেলাই তাকে নিয়ে রওয়ানা হতে পারি। ধর্ম্মশালাটি মোটেই ভাল নয়। দ্বিতলে খানিকটা জায়গা পরিস্কার করে নিলুম। রাত্রে যখন পিশুর কামড়ে অস্থিব তখন মনে হল ঘরে না থেকে বাহিরে খোলা স্থানে শুলেই ভাল হত।

সকালে কুলিটা বোঝা বাঁধবার জন্য দড়ি আনতে গেল কিন্তু আর এল না। তখন আবার ঐ দোকানদারের কাছে গেলুম। সে তখন দোকান খোলেনি। অপেক্ষা করতে হল। যখন এল সব বললুম। সে বললে আচ্ছা দেখি অন্য কুলি। খোঁজা খুঁজি করে একটি ছেলেকে আনল। দেখে বললুম

এ যে ছেলেমানুষ, এ মোট নিয়ে যাবে কি করে। সে বলিল "পাহাড়ি ছেলে খুব নিয়ে যেতে পারবে, তবে এ থাল পর্য্যন্তই যাবে"।

থাল এখান থেকে দশ মাইল, প্রায় সবটাই নাবাই পথ। ছেলেটিকে নিয়ে এলুম। সে বেশ গুছিয়ে জিনিষ পত্র বেঁধে নিয়ে চল্‌ল। পথে দেখলুম এক মিশনারির কন্যা বেশ বড় বাঙ্গলো করে স্থায়ী ভাবে আছেন।

থালে আমাদের পৌঁছে দিয়ে ছেলেটি ফিরে গেল। আবার কুলির চেষ্টায় ঘুরলুম কিন্তু সেদিন কিছু হল না। কয়েকজন ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া নেবার কথা বলিল। "অনেক চড়াই, ঘোড়া না নিলে পারবে না।" কিন্তু আমি বললুম "না, আমরা হেঁটেই যাব।" পরদিন এক কুলি হল কিন্তু তখন আর এগোবার সময় নেই। এখানে দেড় দিন নষ্ট হল। এ জায়গায় কাঁকড়া বিছে আছে। এক দোকানের ওপরের ঘরে যেখানে আমরা ছিলুম রাত্রে বিছানা পাতবার সময়ে দেয়ালে একটা বিছে দেখে তাকে তাড়াতাড়ি মারলুম। আরও বিছে বেরোতে পারে, কিন্তু কি করব, এখানেই শুতে হবে। দেয়াল ছাড়িয়ে বিছানা করে ভয়ে ভয়ে মা ও আমি শুলুম।

শেষ রাত্রেই উঠে পড়লুম। শেষ জ্যোৎস্না, মনে হল সকাল হয়ে গেছে। কাল এখানে আটকে ছিলুম, চলা হয়নি। সেজন্য অগ্রসর হতে ব্যস্ত। এখান থেকে ক্রমান্বয়ে চড়াই খানিকটা

উঠে যাবার পর শুনতে পেলুম কোথায় চারটের ঘণ্টা বাজল। এখনও সকাল হয়নি দেখে সেখানে বসলুম। বসতে বসতেই চোখ ঢুলে এল, কিন্তু কয়েক মিনিটের বেশি বোধ হয় বসিনি। উঠে আবার আমরা চলতে লাগলুম। অনেকটা চড়াইর পর পথ পাহাড়ের অপরদিকে ঘুরে গেল। পাহাড়টা এখানে সোজা উঁচু দেয়ালের মত। উপর থেকে স্থানে স্থানে জল পড়ছে। এই উঁচু জায়গা থেকে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। এবার পথ মোটামুটি সোজা।

বেশ খাণিকটা যাবার পর দিদিহাট নামে এক ছোট গ্রাম এল। এখানে দু তিনটি ছোট দোকান। একটির সামনে গিয়ে দাঁড়াইলে দোকানদার খুব আগ্রহের সহিত বসাইল। এখানেই রান্না খাওয়া করে আমরা আসকোট যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। আসকোট এখান থেকে সাত মাইল। আমাদের এগার মাইল আসা হয়ে গেছে। আসকোট পর্য্যন্ত আর চড়াই নেই। আকাশ একটু ঘোলা ঘোলা, দোকানদার এইখানেই থাকিতে বলিল। কিন্তু আমরা ইতস্তত না করে এগিয়ে পড়লুম।

আসকোটের এক মাইল আগে একটু বৃষ্টি এল। পা বাড়িয়ে চলে আসকোট পৌঁছতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু ভেজা বাঁচল না। তবে খুব বেশি নয়। আসকোটে পৌঁছলুম। এখানে ধর্ম্মশালা বেশ ভাল। দোতলা, উপরে তিন চার খানা বেশ বড় ঘর ও তার সামনে চওড়া বারাণ্ডা। মেঝে কাঠের, সে জন্য ঠাণ্ডা নয়।

নিচে সামনে প্রাঙ্গণে কয়েকটা মাল-বাহি খচ্চরকে নিয়ে একজন এল, এসে এক এক করে বোঝা নাবিয়ে খচ্চরদের বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের শুকনো ঘাস খেতে দিল। দেখে আমার মনে হল শুকনো ঘাস খেয়ে খচ্চর কি করে অত শক্তি পায়। শুকনো ঘাসে আমাদের হিসেবে প্রোটিন ভিটামিন না থাকলেও নিশ্চয় তাতে যথেষ্ট শক্তি আছে, যে শক্তি ঘোড়া, খচ্চর তাহা থেকে নেতি পারে। শক্তি (energy) সবেতেই আছে তবে সে শক্তি নেবার ক্ষমতা চাই।

মা রান্নার জোগাড়ে বসলেন, আমি রাজাবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চললুম। ইঁহার বাড়ি বেশ বড় ও সুসজ্জিত। আমাকে সমাদরে বসিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করলেন। বলিলেন "আমার হিসেবে আপনার আরও আগেই আসবার কথা। আপনি না আসায় আমি যারা যাচ্ছে আসছে তাদের আপনার কথা জিজ্ঞেসও করছিলুম।" আসকোট থেকে আগের জন্য কুলি চাই বলাতে উনি বলিলেন কুলি ঠিক করে দেবেন। তবে সে কাল যাবে না পরদিন যাবে। তিনি এক চিঠিও আমাকে লিখে দিলেন ধারচুলায় রায় সাহেব প্রেম বল্লভের নামে। তাঁহার আন্তরিকতা ও সৌজন্যে প্রীত হয়ে ধর্ম্মশালায় ফিরলুম। কুলির জন্য এখানেও একদিন গেল।

দ্বিতীয় দিন রওয়ানা হবার সময় আকাশ পরিষ্কারই ছিল তবে আগের দিনের বৃষ্টির জন্য পথ স্থানে স্থানে পেছল। দুই আড়াই মাইল পর গোরী গঙ্গা ও কালীগঙ্গার সঙ্গম। পুলের ওপারে একটি ছোট দোকান। কিঞ্চিত দূরেই জোলজিপি যেখানে শীতকালে বেশ বড় মেলা বসে। স্থানটিও মনোরম। আরও মাইল কয়েক গিয়ে বালুয়াকোট। এখানে শীতকালে উপর থেকে ভোটিয়ারা নেবে এসে থাকে। এখন তাদের ছোট ছোট অনেক বাড়ি খালি রয়েছে। এখানে কিছু মুসলমানেরও বাস। একটি ছোট দোতলা বাড়ি, নিচে দোকান উপরে থাকবার ঘর আছে দেখে তাইতে গেলুম। বাড়িটি মুসলমানের, দোকানও তার, তবে দোকানে এক হিন্দুকে বসিয়েছে। নিজেরা সব সময় থাকে না, এখনও ছিল না। এইখানে উপরের ঘরে গিয়ে উঠলুম। এখানে এই মুসলমানের পোষা একটি বেশ বড় সাদা ছাগল ছিল, ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমরা কৈলাশ হয়ে ফেরার সময়েও এখানে ছিলুম। তখন ঐ মুসলমানও এখানে ছিল আমাদের পাশের ঘরে। সেদিন সকালে বাহিরে গিয়ে দেখি পাশে গোয়ালের মত এক ঝোপড়ায় ঐ লোকটি নিজের ঐ পোষা ছাগলটিকে ফেলেছে, হাতে তার ছোরা। তাকে নিজের পোষা লালিত পালিত ছাগলটিকে হত্যা করিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত। তাড়াতাড়ি সরে গেলুম। মানুষের মত অন্তরহীন নির্ম্মম নিষ্ঠুর জীব সৃষ্টিতে নেই। মানুষই পশুকে পুষে,

পুষ্ট কোরে নিজে খাবার জন্য হত্যা করে। এবং পশুবলি দিয়া দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করিতে চায় যাহাতে দেব-দেবীর প্রসাদে তাহার স্বার্থ ও কামনা সিদ্ধ হয়। দেব-দেবী যে তাহাতে সন্তুষ্ট হন না, হইতেও পারেন না তাহা লোভান্ধ মানুষ বোঝে না।

সকালে যখন অগ্রসর হলুম তখন বৃষ্টির কোন লক্ষণ ছিল না। সূর্য্যের আভায় পূর্ব্বদিক আরক্তিম। পথ ভাল, মাঝে মাঝে অল্প ওঠা-নাবা। কুলি পিছনেই ছিল, কিন্তু এক পগ্‌দণ্ডি ধরিয়া সে আমাদের আগেই হইয়া যায়। ছয় সাত মাইল চলে এসেছি তখন কোথা থেকে মেঘ এসে বৃষ্টি আরম্ভ করিল। আমাদের সঙ্গে একটি ছাতি, তাহা খুলে মা ও আমি চলে চল্‌লুম। কিন্তু বৃষ্টি জোর হতে একটা গাছের নিচে বসতে হল। বৃষ্টি ধরতেই আমরা উঠলুম। কাপড় জামা কতকটা ভিজে গেছে। সামনে থেকে একটি ছেলে আসছিল। সে বলিল "সামনে সমুন্দর হো গয়া।"

সমুদ্র অর্থে কি তা বুঝলুম না। এগিয়ে গিয়ে জানলুম। তার বলবার মানে ছিল সামনে জলময় হয়ে গেছে। পাহাড়ের উপর থেকে এক জলধারা স্ফীত হয়ে এসে নিচে নদী পার হবার কাঠের পুল ভেঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। লোকে এপার ওপার করতে পারছে না। কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, পার হওয়া অসম্ভব। পাশে একটা ছোট দোকান। আবার টিপটাপ বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আমরা দোকানের ভিতর ঢুকলুম। একটি ছেলে দোকানে বসে। দোকানে আছে ছোলা ভাজা, একটু গুড় ও

ঐরকমই আরও কিছু জিনিষ। আরও দুচার জন লোক দোকানের ভিতর আশ্রয় নিল। ইতিমধ্যে ছেলেটির বাপ এসে ছেলেকে বলিল জিনিষ পত্র নিয়ে দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে আসতে। কারণ যদি আবার বৃষ্টি আসে ত দোকানও ভেঙ্গে ভেসে যাবে। আমরা সব বেরিয়ে এলুম।

তখন গ্রামের প্রধান এসে আমাদের সকলকে তার বাড়ী যেতে বলিল। এর নাম প্রতাপসিং। এ এখানে ডাকের চিঠি পত্রও বিলি করে। পত্র বাহকদের এখানে হলকারা বলে। প্রতাপসিং আমাদের সকলকে সমাদরে গৃহে নিয়ে গেল। ঘরখানি বড়ই। সকলে আমরা বসলুম। একধারে রাঁধবার উনুন পাতা ছিল। সে কাপড় ছেড়ে একটা উলের চাদরের মত পরে, খালি গায়ে উনুনের সামনে গিয়ে বসল। প্রতাপসিং ত ব্রাহ্মণ, কিন্তু এ অঞ্চলে যারা ব্রাহ্মণ নয় তারাও রাঁধিবার সময় এইরূপ উলের চাদর বা কম্বল জড়িয়ে শুদ্ধাচারে খালি গায়ে রাঁধতে বসে। আগন্তুকদের মধ্যে দুতিন জন উঠে রান্নার জোগাড়ে গেল। কেহ জল আনিল, কেহ আটা মাখিতে বসিল, আর প্রতাপসিং রুটি করিতে লাগিল। এখানে সব সময় তরি তরকারি হয়না, সেই জন্য যখন যাহা হয় তাহা শুকাইয়া রাখে। প্রতাপসিং শুকনো মূলোর তরকারি করিল ও তারপর সকলকে খেতে বসিতে বলিল।' আমাদেরও বসিতে বলিল। আমি বললুম আমরা আর কিছু খাব না। প্রতাপসিং বলিল "তা হয় না। অতিথি অভুক্ত থাকিবে তা হবে না।"
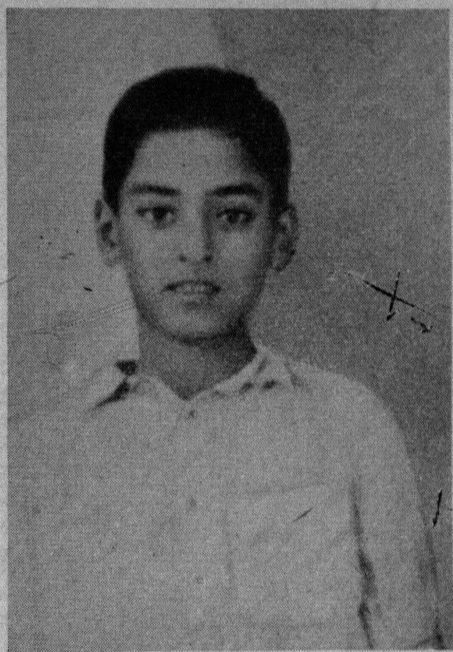
যোগী বালক শঙ্কর প্রসাদ

গৌরী কুণ্ড

[*Photo by*—Swami Pranabananda

মা
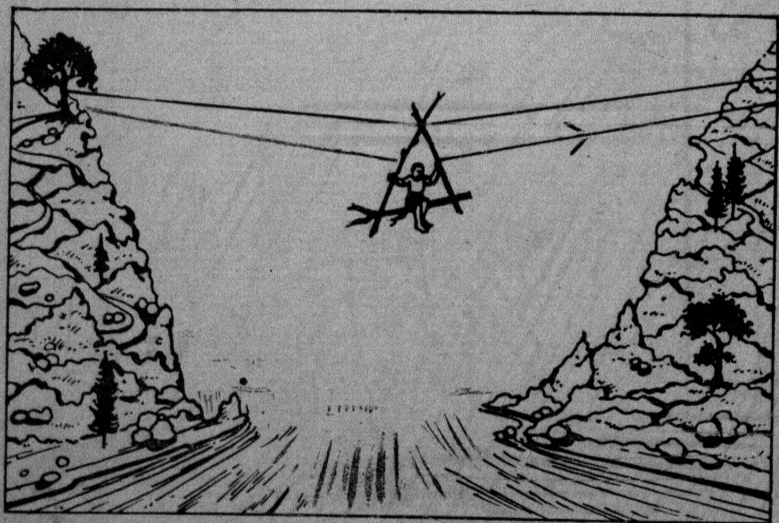
নদী পার হওয়া

[পৃষ্ঠা ৫৭

"আচ্ছা, তাহলে কোন এক আধটা ফল থাকে ত দাও।"

সে বলিল "এখানে ত এ সময় কোন ফল হয় না।"

"আচ্ছা, যদি ছাতু থাকে ত তাই দাও।"

"এখানে ছাতুও হয়না।"

আমি তখন মাকে বললুম "মা আমরা কিছু না খেলে এরা দুঃখিত হবে, তুমি দুখানা রুটি করেই নাও।"

প্রতাপসিংকে বললুম "বেশ, তাহলে দাও আমরা রুটি করে নি। আমরা নিজের হাতে করে খাই।"

সে তখনি আর এক ধারে এক উনুন ধরিয়ে দিল এবং আটা, ঘি, জল সব এনে দিল। সরল প্রাণের এরূপ আন্তরিক যত্নের অতিথি সৎকার সভ্য সমাজে দেখা যায় না। হাতে বেলে মা রুটি করলেন, অতি তৃপ্তির সহিত আমরা খেলুম।

সকলে খেয়ে শুয়ে পড়ল। আমাদের পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেল ও একটা কম্বল এনে দিল, আমার আপত্তি শুনিল না। তাহাদের যত্নে আমরা সেদিন যেরূপ আরামে ছিলুম সেরূপ আরাম পূর্ব্বে কোথাও পাইনি।

সকালে উঠে বাইরে গিয়ে দেখি নদী পার হবার জন্য প্রতাপ সিং এবং আরও কয়েকজন লম্বা লম্বা ঘাস নিয়ে পাক দিয়ে মোটা দড়ি করিতেছে। দড়ি নদীর দুই পারে শক্ত করে বড় পাথরে বা গাছে বাঁধা হবে। দড়ির একদিকে পাথর বেঁধে ওপারে ছুঁড়ে

ফেললে ওপারের লোক তাহা ধরে বড় এক পাথরে বা গাছে জড়িয়ে বাঁধবে। দুদিকে বাঁধা হলে তিন খণ্ড কাঠ ত্রিকোন করে বেঁধে এই দড়ির উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই ত্রিকোন কাঠে লোককে বসিয়ে ওপার থেকে টানা হয়।

এইভাবে লোক পার হয়। মাঝামাঝি এলে লোকের ভারে দড়িটা এমন দোলে যে লোকে ভয় পায় সেজন্য তাকে দড়ি দিয়ে ত্রিকাষ্ঠের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। প্রথমটা দেখে ভয় হল, তারপর অন্যদের পার হতে দেখে ভয় চলে গেল। আমি নিজেই শক্ত করে ধরে বসলুম, আমাকে বাঁধতে দিলুম না।

ওপারে নেবে দেখলুম কুলিটা দাঁড়িয়ে আছে। সে আগের দিন পুল ভাঙবার আগেই পার হয়ে গিয়েছিল। এর কাছেই আমাদের সব জিনিষপত্র ছিল। আমাদের সঙ্গে মাত্র দশ-বারো আনা পয়সা ভিন্ন আর কিছু ছিল না। কুলিও তাহা জানত, জানত না কেবল চুরিবিদ্যা, নচেৎ ইচ্ছামত সম্পূর্ণ নিরাপদে আমাদের যা কিছু নিতে পারত। বহুদিন আগে হুয়েনসাং ভারত থেকে ফিরে গিয়ে লিখেছিলেন যে এদেশে লোকে গৃহে তালা দেয় না, তালা না দিয়েই যেখানে ইচ্ছা চলে যায়। সেদেশ ও সেদিনের লোক এখনও আছে, তবে যে অঞ্চলে আধুনিক স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটি হয়েছে সে অঞ্চলে নেই।

ধারচুলা নিকটেই। কুলি রায়সাহেব প্রেমবল্লভের বাড়ী জানিত। আমরা গিয়ে রায়সাহেবের বাড়ির সামনে একটা গাছতলায় দাঁড়ালুম ও কুলির হাতে আসকোটের

রাজবার সাহেব যে চিঠি রায়সাহেব প্রেমবল্লভকে লিখে দিয়েছিলেন সেই চিঠি রায়সাহেবকে গিয়ে দিতে বললুম। সে চিঠি নিয়ে গেল কিন্তু কেহ এল না। আমরা দাঁড়িয়েই আছি আর ভাবছি চিঠি পেয়ে কেহ আসে না কেন। খাণিকক্ষণ পরে এক সুদর্শন বৃদ্ধ চিঠিখানা হাতে নিয়ে এলেন। তাঁহার মাথার চুল সব সাদা, গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর, মুখে প্রশান্তভাব। অতি সযত্নে আমাদের তিনি নিয়ে গিয়ে একটি ঘর খুলে বসাইলেন ও কুলিকে আমাদের জিনিষ এনে রাখতে বললেন। ঘরটি বেশ ভাল; একটি নেওয়াড়ের খাট, একটি টেব্‌ল ও একটি চেয়ার রয়েছে। এই ঘরটি বললেন তাঁর ছেলের, ছেলে তখন সেখানে নেই। তাঁহার ছেলের ঘরে আমাদের এত যত্ন করে রাখবার কারণ পরে জেনেছিলুম। তাঁহার স্ত্রী এসে মার রান্নার ব্যবস্থা করে দিলেন।

পুর্ব্বদিনের জোর বৃষ্টির দরুণ এদিককার পুল যেমন ভেঙে গিয়েছিল সেইরকম ধারচুলার অপরদিকেও অনেক জায়গায় পাহাড় ভাঙ্গায় শুনলুম সামনে পথ খারাপ, এগোতে পারা যাবে না। দুদিন উপর থেকে ডাক আসেনি, এখান থেকেও যায়নি। উপর থেকে কেহ না আসিলে সামনে পথের অবস্থা কিরকম জানা যাবে না। ততদিন আমাদের এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে। কথায় কথায় পরদিন রায়সাহেব বলিলেন "তোমার কুলি এসে আমাকে যখন রাজবার সাহেবের চিঠি দেয় আমি তখন উপরের ঘরে। ঘরের জানালা খুলে দেখলুম

তুমি ও তোমার মা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। দেখে এতই আশ্চর্য্য হই যে স্ত্রীকে ডেকে দেখালুম ও বললুম 'ঐ দেখ, মা-বেটা কৈলাশ যাচ্ছে'। আমি বহুদিন এখানে আছি, যত কৈলাশ-যাত্রী এখানে আসে তাদের আমি আগে যাবার কুলি ঠিক করে দি, আর এখানকার ধর্ম্মশালায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিই। কিন্তু এতদিনের মধ্যে কখন দেখিনি এরকম মা-বেটা যাচ্ছে, সঙ্গে আর কেহ নেই। কৈলাশে দলবদ্ধ হয়ে লোকে যায়। স্ত্রীও আমার মতই আশ্চর্য্য হয়ে বলিল যে 'এঁদের ধর্ম্মশালায় পাঠিও না, আমাদের বাড়ীতেই এঁদের নিয়ে এস।' আমাদের এই কথাবার্ত্তার দরুণ বাহিরে তোমাদের কাছে যেতে বিলম্ব হয়।"

সত্যই আমাদের মনে হয়েছিল চিঠি পেয়ে ওঁর আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন। ওঁর কথা শুনে এখন কারণ বুঝলুম, আর এও বুঝলুম আমাদের উপর তাঁহাদের দুজনেরই এত স্নেহ যত্ন কেন। প্রেমবল্লভবাবু এখানকার বিশিষ্ট লোক। তাঁর বেশ বড় বাড়ী, জায়গা জমি, দোকান। লোহাঘাটেও তাঁর সম্পত্তি আছে, তবে ধারচুলায় অনেকদিন আছেন। তিনি মাকে আর আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। আশ্চর্য্য হইবারই কথা, কারণ কৈলাশে এরকম মা-বেটা, সঙ্গে আর কেউ নেই, যায় না। কেদার বদ্রী যে'কেহ যেতে পারে, সঙ্গীর দরকার হয় না। কিন্তু কৈলাশ অন্য ব্যাপার। সেইজন্য এখানে স্ত্রীলোকেরা ক্বচিতই যায়। পথে কোন স্ত্রীলোকই দেখিনি। মার আগে

কোন স্ত্রীলোক কৈলাশ গেছেন কিনা জানি না, তবে বাঙালী স্ত্রীলোক যার আগে কেহ যান নাই এটা বোধ হয় নিশ্চিত। ১৯৫৪ সালে যখন আমি দ্বিতীয়বার যাই তখন ফেরার পথে একজন বাঙালী স্ত্রীলোককে তাঁর স্বামীসহ যেতে দেখি। ঠিক মনে নেই, তবে যেন তাঁরা বলেছিলেন যে তাঁরা রানাঘাট থেকে এসেছেন।

ধারচুলায় দুদিন হয়ে গেল। তৃতীয় দিন উপর থেকে এক হলকারা এলে প্রেমবল্লভবাবু তাকে সব পথের বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। সে বলিল যে রাস্তা ত খারাপ, ভাঙ্গা চোরা, যাওয়া কঠিন। কিন্তু আমরা আর কতদিন এখানে আটকে থাকব। চলতে ব্যস্ত। প্রেমবল্লভবাবু তখন হলকারা ও অন্যদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া এবং পথের বিষয় সব জানিয়া বলিলেন, "আমি দুজন লোক ঠিক করে দিচ্ছি। একজন মাল নিয়ে তোমাদের সঙ্গে গারবিয়াং পর্য্যন্ত যাবে, আর একজন, নাম কমলসিং, এ আমার বিশ্বস্ত লোক, এ সমস্ত যাত্রা তোমাদের সঙ্গে যাবে। এ একবার কৈলাশও গেছে। প্রয়োজনে মাতাজীকেও পীঠে নেবে।"

৯

এই ঠিক হল, পরদিন সকালে আমরা যাত্রা করলুম। একটু গিয়েই পথ নেবে গেল একটা নদী পর্য্যন্ত। জল কম, আমরা জুতো হাতে নিয়ে পার হলুম। তারপর চড়াই, পথ

ভাঙা, একটা সরু পগ্‌দণ্ডি ধরে পাহাড়ের গায়ে উঠতে হবে। কমলসিং মাকে পিঠে নিয়ে আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে উঠতে লাগল। খাড়া চড়াই। জায়গায় জায়গায় ঘাস ধরে উঠতে লাগল। আমি তার ঠিক পেছনে পেছনে উঠে চললুম। এক জায়গায় এমন খাড়া চড়াই যে আমি মনে করলুম কমল-সিংকে পিছন থেকে ঠেকনা দি। এই মনে করে তার পিঠের নিচে হাত দিয়ে একটু জোর দিলুম। সে চিৎকার করে বলে উঠল "গির যায়েগা, ছোড় দো।" ঠিকই কথা। সে আন্দাজ করে পা বসিয়ে বসিয়ে প্রয়োজন মত নিজের শক্তিতে উঠছে, তার উপর হঠাৎ আমার জোর পড়লে সে আন্দাজ রাখতে পারবে না, আর তাইতে পা নড়ে যেতে পারে। আমি তৎক্ষণাৎ ভয়ে হাত টেনে নিলুম। এই বিপদের জায়গা অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পার হলুম। খাণিকটা যাবার পর আবার এক নদী। এখানেও পুল ভাঙ্গা। আগের মত দড়ি বেয়ে পার হতে হল।

দশ মাইল পর খেলা। এখানে পৌঁছতেই এক পসলা বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি আমরা পোষ্ট অফিসের পাশের ঘরে গিয়ে উঠলুম। এখানে আরও কিছু ঘর বাড়ী আছে, একটা ধর্ম্মশালাও আছে। এখানকার ঘি প্রসিদ্ধ। এরকম ঘি কোথাও দেখিনি। এখানকার ঘিও যেমন মনে আছে, সেইরকম মনে আছে পাঁওয়ালির উপর দুধ ও মাখমের স্বাদ আর চোপ্তার "মাঠা"র স্বাদ।

খেলা হইতে এক মাইল ধৌলি গঙ্গা পর্য্যন্ত পথ নেবে

গেছে। তারপর পুল পার হয়ে চড়াই। দু মাইল চড়াইর পর ক্ষাণিকটা গিয়ে বৃহৎ পঙ্গুগ্রাম। বিস্তৃত উপত্যকা। নিচে ধৌলি গঙ্গা, দুধারে পাহাড়ের গায়ে ক্ষেত, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘর। দুচারটে দোকান আছে, একটিতে বসে রান্না খাওয়া করে আবার এগলুম। একটা পুল পার হয়ে এক মাইল চড়াইর উপর সুসা। এই সুসা থেকে আর এক পথে তিন মাইল দূরে নারায়ণ স্বামীর আশ্রম। শুনেছি কৈলাশ-যাত্রী সাধুদের উনি সাহায্যও কিছু করেন। আমরা সুসাতে না দাঁড়িয়ে অগ্রসর হলুম। পথ একটু একটু উঠে গেছে, দুপাশে দেওদার। হৃদয় আকর্ষক স্থান। পথ তারপর নেবে চলিল সিরকা বলে এক বড় গ্রামে। এখানে চারিদিকেই চাষবাস ও অনেক ঘরবাড়ী। স্কুলের পাশেই এক ধর্ম্মশালা তৈরি হচ্ছে, সেইখানে গিয়ে উঠলুম। এখানে দু আনা সের আটা আর এক আনা সের আলু। কিন্তু স্থানটা বড় অপরিচ্ছন্ন। বড় মাছি। সন্ধ্যা হয়েছে। আমরা সামনে একটু খোলা জায়গা দেখে রান্না আরম্ভ করলুম। কৈলাশ হতে ফেরৎ চারজন সাধু এসে আমাদের পাশেই আগুন জ্বাললেন ও দোকানে গিয়ে একটা পাত্র এনে তাইতে আলু সিদ্ধ করতে বসালেন। চারিপাশে একটু পরিষ্কার করে রাত্রে শোবারও জায়গা করলেন। হঠাৎ একটা বড় কাঁকড়াবিছে আমাদের পাশ দিয়ে এল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে একটা পাথর দিয়ে মারলুম। তা দেখে সাধুদের একজন বললেন "ভগবানকা জীব"। তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখলুম না, কিন্তু

আমার মনে ভয় হল আরও বিছে ত বেরোতে পারে। আমরা সর্ব্বদাই ভয় করি, সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকি, সেইজন্য ভয়ও আমাদের বেশি করে চেপে ধরে।

রাত্রে স্কুলের বারাণ্ডায় শুয়ে ভয়ে ভয়ে রাত কাটল। গ্রামের মধ্যে বড় নোঙরা। আমরা ভোরেই বেরিয়ে পড়লুম। গ্রামের পর জিপতির চড়াই আরম্ভ হল চমৎকার বনের ভিতর দিয়া। এখানে একরকম ফুল দেখলুম, তাকে পাতাও বলা চলে, দেখতে যেন সাপের ফনার মত। আরও একরকম গাছের পাতা পঞ্চমুখী। পঞ্চানন শিবের স্থান তাই যেন এখানে এরকম পাতা ও ফুল।

জিপতিতে দেখলুম জন তিনেক বাঙ্গালী বসে, এঁরা কৈলাশ হয়ে এসেছেন। কলিকাতায় কালিঘাটে থাকেন। তাঁদের দলের আরও কয়েকজন এখনও এসে পড়েননি! আমাদের আজ মালপায় যাবার কথা। সেইজন্য এখানে বসলুম না, এগিয়ে পড়লুম। এ জায়গাটা ভাল। থাকাই উচিৎ ছিল। তবে আমরা পেছিয়ে গেছি। পথে কদিন নষ্ট হয়েছে, সেজন্য এগোতে ব্যস্ত।

১০

জিপতি থেকে গারবিয়াং পর্য্যন্ত জলের অভাবের জন্য 'নিরপনি' বলে। কালীগঙ্গার ধার দিয়েই প্রায় পথ গিয়েছে, তবে পাহাড়ের গা দিয়ে জলের ঝরণা খুব কম। এখান থেকে

বুধি পর্য্যন্ত রাস্তা খারাপ। চড়াই নাবাই ছাড়া স্থানে স্থানে পথ সঙ্কীর্ণ। জিপতির পরই দু'মাইল খাড়া নাবাই। সাবধানে নাবতে হয়। ওধারের দুই পাহাড়ের ভিতর দিয়া এক বৃহৎ জলধারা বোধ হয় একশ ফুটের উপর থেকে নিচে কালীগঙ্গায় পড়ছে। এতবড় জলপ্রপাত দেখিনি। মাইল দুয়ের পর আর একটা জলপ্রপাত, অত বড় না হলেও বেশ বড়। পথ চলেছে খাড়া পাহাড়ের গা দিয়ে। সরু পথ, নিচে কালীগঙ্গা। কালীগঙ্গার ওধারেও খাড়া উঁচু পাহাড়। মালপা পর্য্যন্ত এইরকম।

সন্ধ্যায় মালপা পৌঁছলুম। সিরকা থেকে মালপা ১৯ মাইল হলেও আমরা তেমন ক্লান্ত হইনি। একটা ছোট নদী এসে এখানে কালীগঙ্গায় পড়েছে। সঙ্গমের ওপর দুখানা ঘর। এতে ডাক বাহক হলকারারা থাকে। যাত্রীরাও একটি ঘরে আশ্রয় নেয়। ঘরের মেঝে পাথুরে, উবড়ো খেবড়ো। এক ধারে একটা গরু বাঁধা। গরুর খাদ্য শুকনো ঘাসও ঘরের মধ্যে। সেই ঘাস মেঝেয় পেতে কতকটা সমান করে তার উপর শোবার ব্যবস্থা করলুম, আর তারই পাশে রান্নাও হল। ঘরে আরও জন কয়েক এসে শুল। তারা শুল আর ঘুমোল। কিন্তু এখানে এমন পিশু যে আমাদের ঘুম আসে না, অস্থির হয়ে এপাশ ওপাশ করি। দ্বিতীয়বার যখন কৈলাশ আসি তখন এখানকার পিশুর কথা মনে ছিল সেইজন্য মালপায় যাতে রাত্রে না থাকতে হয় সেই হিসেবে যাবার ও ফেরবার সময় চলেছি।

এখান থেকে বুধির পথ আগের মতই খাড়া পাহাড়ের গা দিয়ে চলেছে, নিচে কালীগঙ্গা আর কালীগঙ্গার ওপারেও খাড়া উঁচু পাহাড়। পথ সরু, স্থানে স্থানে ভাঙ্গা, সাবধানে চলতে হয়।

বুধি ভোটিয়াদের বেশ বড় গ্রাম। এখান থেকে মাইল চারেক উপরে গারবিয়াং। এখানে অনেক ঘর বাড়ী ও বসবাস। তবে শীতে বেশির ভাগ লোকই নিচে ধাচুরলা, বালুয়াকোট ও অন্যত্র নেবে যায়। এখানে এক ভোটিয়া প্রধান দলীপসিংয়ের নামে রায় সাহেব প্রেম বল্লভ একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম দলীপসিং এখানেই আছে। তখন কমল সিংকে বললাম মাকে নিয়ে তুমি গারবিয়াং চল আমি আসছি। দলীপসিং চিঠি দেখে বলিল "আপনি চলুন, আমিও আসছি।"

বুধি থেকে প্রথম এক মাইল বেশ খাড়া চড়াই। একটু উঠতেই দেখি উপর থেকে একটা পাথর গড়াতে গড়াতে আসছে, একবার এদিক একবার ওদিক দুই পাশের অন্য পাথরে ঠেকিয়া ঠিকরাইতে ঠিকরাইতে। পথ সরু ও ঢালু। কি করব, কোন্ পাশে দাঁড়াব বুঝতে পারছি না। পাথর জোরে চলে আসছে। একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া উপায় নেই। আমার উপর এলে আটকান অসম্ভব আর তখন সরে যাওয়াও অসম্ভব। পাথরটা যেন আমার উপরই আসছে, কিন্তু একটু উপরেই একটা পাথরে ঠেকে আমার পাশ দিয়ে নিচে চলে গেল। আমি আবার উঠতে লাগলুম।

গারবিয়াংএ একটি ধর্ম্মশালা। নিচে ছোট দুখানা ঘর, উপরেও সেইরকম। নিচের ঘরের যা অবস্থা তাতে থাকা চলে না। উপরের একটা ঘরে উঠলুম। গারবিয়াংএ ভোটিয়াদের অনেক ঘরবাড়ী, তবে শীতের সময় তারা এখানে থাকে না। গারবিয়াংয়ের উচ্চতা দশ হাজার ফুট। এখান থেকে কৈলাশ যাত্রার প্রয়োজনীয় সব জিনিষ নিতে হয়। তাঁবু, তিন সপ্তাহের মত খাদ্য, কম্বল ইত্যাদি। দলীপসিংয়ের বাড়ী গিয়ে আমি একটা তাঁবু, আটা, ঘি, ছাতু ও কিছু চাল নিলুম। দুটো খচ্চর ঠিক করলুম, একটাতে মা বসবেন আর একটাতে তাঁবু ও আর সব জিনিষ যাবে।

১১

পরদিন তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে দলীপসিংয়ের বাড়ী গেলুম। সব জিনিষ একত্র করা হল, খচ্চরওয়ালা গুছিয়ে বাঁধাবাঁধি করিতে লাগিল। তাদের কিন্তু তখন খাওয়া হয়নি। আমাদের বললে "তোমরা চল"। আমি মা ও কমলসিংকে চলতে বলে খচ্চরওয়ালাদের তাড়া দেবার জন্য অপেক্ষা করে রইলুম। খচ্চরওয়ালারা আমাকেও এগোতে বলিল। আমি খানিকখণ ইতস্ততঃ করে উঠে পড়লুম। মা ও কমলসিং ততক্ষণ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। গারবিয়াং থেকে কালীগঙ্গা পর্য্যন্ত পথ নেবে গেছে। কালীগঙ্গার উপর একটা পুল ওপারে যাবার জন্য। এধার দিয়েও এক রাস্তা চলে

গিয়েছে। কোন্ দিকে যাব আমি ঠিক করতে পারলুম না। কেহ নেই যাকে জিজ্ঞেস করব। এধারের পথই প্রশস্ত দেখে মনে হল এই পথই কালাপানি গিয়েছে। এপথ ধরে চললুম, কিন্তু মাকে ধরতে না পেরে মনে সন্দেহ হতে লাগল যে যে পথে যাচ্ছি সেটা কালাপানি গেছে কি না। মা এত বেশি এগিয়ে যেতে পারেন না যে এতক্ষণে আমি বেগে এসেও তাঁকে ধরতে না পারি। সামনে থেকে দুজন স্ত্রীলোককে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলুম মা ও কমলসিংকে যেতে দেখেছে কিনা, কিন্তু তারা আমার কথা বুঝল না, হিন্দি বোঝে না। কি বুঝে তাহারা সামনের পথই দেখাল। আমি বেগে এগিয়ে চললুম, মাঝে মাঝে ছুটতে লাগলুম। মন বড় চঞ্চল। এত ছুটে এসেও এতক্ষণে মাকে ধরতে পারছি না কেন। এক বৃদ্ধা আসিতেছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলুম কালাপানি কোন দিকে। সে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল কালীগঙ্গার অপর ধারে। তাহার কথার ঈঙ্গিতে বুঝলুম এখানে কালীগঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাওয়া যায়। আমি আরও একটু এগিয়েও পার হবার পুল দেখতে পেলুম না। নদীর ধারে নেবে গিয়ে পার হতে সাহস হল না, কত জল জানি না আর স্রোতও খুব। হেঁটে পার হবার চেষ্টা করা মোটেই সমিচীন মনে হল না। আবার উপরে উঠে এলুম। সামনে কতদূরে পুল আছে, পুল আছেই কিনা জানি না। সে কারণে আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। মা এপথে নিশ্চয় যাননি। এই ভেবে ফিরলুম।

সন্ধ্যা হয়ে যাবে, কতদূরে মা জানি না। অত্যন্ত চিন্তিত মনে পিছনে ছুটলুম, গারবিয়াং থেকে নেবে এসেই যে পুল সেই পুলের দিকে। ঐ পুল দিয়েই ওপারে যেতে হবে। পূর্ব্বে একবার পাহাড়ের পথে সিমলা থেকে মশুরি আসিতে রাত্রি হয়ে যায় ঘোর জঙ্গলের ভিতর। তাহা মনে ছিল। মা কতদূর নিশ্চয় চলে গেছেন, সঙ্গে কমলসিং ভিন্ন কেহ নেই। আমি দুর্ভাবনায় একবার ছুটি, একবার হাঁটি। ক্লান্ত কিন্তু দাঁড়াবার জিরোবার সময় নেই। পুল দেখতে পেয়ে একটু আস্বস্ত হলুম। দু'একজন লোকও দেখলুম। তারা কালাপানির পথ পুলের ওপারে বলে চলে গেল। পুলের ওপারে গিয়ে দেখি দুদিকে দুই পগদণ্ডি গেছে। একটির উপরে দেখলুম একটা ঘর। ঘরে লোকও হবে মনে করে উঠে গেলুম। একটি লোক ঘরে শুয়েছিল, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করায় সে বলিল অপর পগদণ্ডিই কালা-পানির পথ। আবার পুলের কাছে নেবে এসে ঐ পগদণ্ডি ধরে উঠে চললুম। এখন ঠিকপথ পেয়েছি জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে জোরে চললুম। আবার একটু নাবা, তারপর একটা ক্ষুদ্র জলধারা, পার হয়ে আবার ক্ষাণিকটা চড়াই। উপরে উঠে এসে দেখি দশ বার জন পাহাড়ি বসে। এতদূর ছোটাছুটি করে এসে ক্লান্ত হলেও বসবার সময় নেই। জোরে এগিয়ে চললুম। সামনে দেখি আমাদের খচ্চরওয়ালাদের একজন একটি খচ্চরের উপর বসে আমার দিকে আসছে। কাছে এসে খচ্চর থেকে নেবে খচ্চরওয়ালা বলিল যে মা তাকে পাঠিয়েছেন

আমাকে বসিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। মার সংবাদ পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। তাকে ফিরে গিয়ে মাকে বসিয়ে নিয়ে চলতে বললুম, আমি পিছনে আসছি। খচ্চরে উঠে বসে তাকে তাড়াতাড়ি মার কাছে যেতে বললুম। মা একলা কোথায় বসে আছেন সে জানে, আমি জানি না। সামনে এগিয়ে দেখি কমলসিং বসে আছে। মা তাকে এখানে আমার জন্য বসে থাকতে বলেছেন। যদি কমলসিং এখানে না থাকত ত কি করে যেতুম জানি না। সামনে বন, জনপ্রানী নেই। কতদূর কালাপানি জানি না। বেলা পড়ে গেছে, পা-ও যেন আর চলে না, অত্যন্ত ক্লান্ত। কমলসিংকে পেয়ে ভরসা হল। দুজনে আস্তে আস্তে এগোলুম। দুজন লোক সামনে থেকে আসছিল। তারা বললে কালাপানি সেখান থেকে চার মাইল। আর হাত দিয়ে দেখালে একটা উঁচু পাহাড় যেটা পার হয়ে যেতে হবে। এখনও চার মাইল যেতে হবে আর ঐ পাহাড় ডিঙ্গতে হবে, কি করে যাব কিন্তু যেতেই হবে। কমলসিং এর পাশে পাশে চললুম। পাহাড়ের উপর পথ উঠে চলল, সন্ধ্যাও আকাশ থেকে নেবে এল। আমরা সাবধানে উঁচু-নিচু পাথুরে পথের উপর চলতে লাগলুম। পাহাড়ের ওধারে একটা পুলের উপর দিয়া কালীগঙ্গা পার হলুম! একটা ছোট ঘর দেখে বুঝলুম কালাপানি এসে গেছে। কমলসিংয়ের পিছনে পিছনে দেখে দেখে চললুম। মাঝে মাঝে পথে জল। সামনে আর একটা ঘর, একটু বড় ঘর, ভিতরে আলো জ্বলছে। ঢুকে দেখি আমাদের খচ্চরওয়ালারা

ও আরও কয়েকজন আগুন জ্বেলে রুটি করছে। মা একধারে বসে আছেন। মাকে আমার অন্য পথে চলে যাওয়ার কথা বললুম। আমার আসতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি বড় চিন্তিত ছিলেন। গারবিয়াংএ মাকে কমলসিংয়ের সঙ্গে আমি এগোতে বলি। তিনি এগিয়ে আসেন। কিছু দূর আসার পর যখন পিছন থেকে দুই খচ্চরওয়ালা তাঁর কাছে এসে পৌঁছয়, তখন আমাকে না দেখে তাদের জিজ্ঞেস করায় তারা বলে যে তারা গারবিয়াং থেকে চলবার আগে আমি চলে এসেছি। শুনে মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে খচ্চরওয়ালাদের বলেন ফিরে গিয়ে আমাকে দেখতে। তারা বলে আমি ঠিকই আসব, কিন্তু মা তা না শুনে বলেন যে তিনি আর আগে যাবেন না। তখন একজন খচ্চর-ওয়ালা পিছনে আমার খোঁজে আসে। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মাকে গিয়ে বলাতে মা সেখানে কমলসিংকে আমার অপেক্ষায় থাকতে বলেন।

এ ঘরে খচ্চরওয়ালারা ও আরও কয়েকজন থাকায় স্থানাভাব দেখে আমি মা ও কমলসিং নিকটে আর একখানা যে ঘর আসার সময় দেখে ছিলুম তাইতে গেলুম। ঘরটি ছোট, দরজা নেই। কমলসিং কাঠ ও জল আনল। আমাদের হ্যারিকেন ল্যাম্প জ্বাললুম। রান্না-খাওয়া হল। সকালের জন্য কয়েক-খানা পুরি রহিল। স্থান সঙ্কীর্ণ, কোন রকমে তিনজনের শোবার ব্যবস্থা হল। রাত্রে ইঁদুর ঢাকা দেওয়া খাবার টানা টানি করায় ঘুম ভাঙল কিন্তু ইঁদুরের যাতায়াত রোধ করার কোন উপায় নেই।

আমরা যেখানে ছিলুম তার নিকটেই একটা জলের উৎস, (spring)। ইহাকেই কালাপানি বলে। কালীকে উৎসর্গিত বলে নাম কালিপানি। কালীপানি নাম কালাপানি হয়ে গেছে। জলের তলায় পাথর কাল, সেইজন্য জল কাল দেখায় যদিও জল স্বচ্ছ পরিস্কার।

১২

সকালে তৈরি হয়ে খচ্চরওয়ালাদের কাছে গেলুম। তারা বললে তোমরা চল আমরা আসছি। আমরা তিনজন তাদের কথায় এগলুম। শেষ রাত্রেই, বরং তার আগেই লিপু পার হবার জন্য এখান থেকে চলা উচিৎ, কিন্তু আমরা জানতুম না। তাই এগিয়ে পড়লুম। খচ্চরওয়ালারা জানত সেজন্য তাদের তৈরি হতে দেরি হয়ে যাওয়ায় তারা সেদিন কালাপানি থেকে রওয়ানাই হয়নি যদিও আমাদের চলিতে বলেছিল।

আমরা চললুম আবার কালীগঙ্গা পার হয়ে ওপার দিয়ে। পিছনে ফিরে ফিরে দেখি খচ্চর আসছে কিনা, কিন্তু দেখা নেই। খচ্চরওয়ালারা যে আসবেই না তা জানতুম না, তাহলে আর এগতুম না, ফিরে যেতুম। একটা খচ্চর মার বসবার। তারা এসে আমাদের ধরে নেবে মনে করে আমরা এগিয়ে চললুম। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ আসছে যাচ্ছে। এক জলের ধারে একটু বসলুম। খাবারের মধ্যে ছিল রাত্রে করা পুরি ও কিছু কিশমিশ। মা পথে আনা পুরি খাবেন না, ক'টা কিশমিশ

মাত্র খেলেন। এখনও খচ্চরওয়ালাদের দেখা নেই। আরও খাণিক দূরে সিনটিম। এখানে চার দেয়ালে ঘেরা একটা ঘর, দরজা নেই, উপরে ছাদও নেই।

যদিও লিপুর চড়াই কালাপানির ১২,০০০ ফুট থেকে ১৬,৭৫০ ফুট, চড়াই কিন্তু খাড়া নয়, বেশির ভাগটাই আস্তে আস্তে উঠে গেছে। বেলা পড়ে আসছে, বাতাস জোর হয়েছে, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। কি করব, কোনও আশ্রয় নেই। কালাপানি বহুদূরে পিছনে। সামনে লিপু। তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস ও বৃষ্টিতে শরীর মন অবসন্ন। সমস্ত দিন একরকম না খাওয়া, মা ত মাত্র কটা কিশমিশ নিয়েছেন। সন্ত্রস্থ হয়ে ছাতা খুলে একটা পাথরের আড়ালে বসলুম। বাতাসের বেগে ছাতা খুলে রাখা গেল না। দুর্যোগ কম হবার লক্ষণ নেই। লিপু আর লিপুর বরফ দেখে ভয় হল। এগোতে সাহস হয় না, যুক্তিসঙ্গতও নয়। কমলসিংকে বললুম "কমলসিং, চল ফিরে যাই।" কমলসিং এগিয়ে এসে জোর গলায় বলিল "পিছে যায়েগা তো মর যায়েগা। চলো আগে" বলে সে মার এক হাত ধরে তুলিল, আমি অপর হাত ধরলুম।

বৃষ্টিতে মার কষ্ট হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও তাঁর মন ব্যাকুল ও বিষন্ন হইত, শরীর যেন অবসন্ন হইত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে আমার মনও অবসাদাচ্ছন্ন হয়। কিন্তু কোন উপায় নেই, এখানে কোন আশ্রয় নেই। চলিতেই

হইবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দশ মাইলের বেশি এসে গেছি। পিছনে ফিরলে কালাপানি পৌঁছতে পারব না, রাত হয়ে যাবে। তাই কমলসিংয়ের কথায় দ্বিরুক্তি না করে চললুম আর তাইতেই রক্ষা পেলুম। কমলসিংয়ের গায়ে একটা জামা, পায়ে জুতো নেই, আমাদেরও পরনে কাপড়, গায়ে সাধারন একটা কোট, একটা হালকা আলোয়ান, যাকে গরম বলা যায় না, এবং পায়ে কেড্‌স। যেন হতাশ হয়ে কমলসিংএর টানে চললুম। খানিক পরে সামনে বরফ, তার উপর দিয়ে যেতে হবে। তবে বেশি নয়। সন্তর্পণে আস্তে আস্তে পার হলুম। তারপর লিপুর শেষ চড়াই।

দুপাশে দুই পাহাড়, মাঝে সরু ব্যবধান। ইহাই লিপু লে, লিপু পাস। এক শিলা-স্তুপ দেখে বুঝলুম চড়াই শেষ। চড়াইর উপর এইরকম স্তুপ দেখেছি। যে যায় সেই দুএকটা পাথর রাখে তাইতেই স্তুপ হয়। ছেঁড়া নেকড়াও কেহ কেহ পাথরে বেঁধে দেয়। এ রকম স্তুপ পথ নির্দেশক চিহ্নও হয়। পাস পার হয়ে ওধারে গিয়ে যা দেখলুম তাহা অবিশ্বাস্য, অবাক্ হয়ে গেলুম। এদিকে আকাশ পরিষ্কার, বাতাসে জোর নেই, ঠাণ্ডাও তেমন নয়। মনে হল কমলসিং জোর করে এদিকে নিয়ে আসায় বেঁচে গেছি। যদি কালাপানির দিকে ফিরতুম তাহলে যে কি হত জানি না কারণ ঐ দুর্যোগে সন্ধ্যার মুখে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হত না, কালাপানি পৌঁছতে পারতুম না। মাঝ পথে কোনরূপ আশ্রয় নেই। গরম বস্ত্র সঙ্গে কিছুই ছিল

না। এ অবস্থায় ঠাণ্ডায় রাত্রে বরফ বৃষ্টি আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় যে কি হত ভাবতেও পারি না। সে সময়ের কথা মনে হলে এখনও শরীর মন শিহরে উঠে। সত্যই সেদিন কমলসিং আমাদের বাঁচিয়েছে।

লিপুর ওপারে ঐরূপ দুর্যোগ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি ও তীব্র বাতাস, আর এপারে প্রকৃতি শান্ত, নীল আকাশ, অস্ত-প্রায় সূর্য্যের আরক্তিম আভা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। লিপুর এপারে ওপারের মধ্যের অল্প ব্যবধানে যে প্রাকৃতিক এত অসম্ভব পরিবর্ত্তন হতে পারে তাহা চোখে না দেখলে কল্পনাও আসতে পারে না। মেঘ হিমালয়ের উচ্চ পর্ব্বত-মালা অতিক্রম না করতে পেরে ঐদিকেই প্রায় আটকে যায়, সেজন্য তিব্বতে বৃষ্টি খুব কম। ভাদ্র মাসে কিছু হয়। এইজন্য তিব্বতকে rain-less, wind-swept landও বলা হয়। তিব্বতে বৃষ্টি কম বলে অনেক জায়গাতেই দেখেছি ঘরের উপরের ছাদে ক্ষাণিকটা করে খোলা থাকে, ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার জন্য।

লিপুর এপারে পথ টানা নেবে গেছে। সামনে আর উঁচু পাহাড় নেই, গাছ পালাও মোটে নেই, শুকনো পাথর বালির এক বিস্তৃত প্রাঙ্গন। আমরা উল্লসিত হয়ে নেবে চললুম। কমলসিং এখনও মার হাত ধরে আর আমি মার আর এক হাত ধরে বেশ জোরে নেবে চললুম। মা পরে বলেছিলেন যে তাঁর

মনে হয়েছিল যে কি এক অজানা শক্তি তাঁকে সেদিন নিয়ে গিয়েছিল।

আমরা চলেছি, পথের কোন রেখা, নির্দেশ নেই। একটা পশু পক্ষীও নেই। প্রাণী শূন্য, নিস্তব্ধ বিরাট এই রাজ্য। কেবল আমরা তিনটি প্রাণী চলেছি, চলেছি কোথায় গিয়ে পৌঁছব জানি না, তবে কোথাও পৌঁছতে হবে কেবল ইহাই মনে রয়েছে। আমরা নিঃশব্দে নেবে চলেছি, নিশ্বাস ও পদশব্দের দ্বারাও চারিদিকের শান্ত নীরবতা ভাঙতে যেন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। সূর্য্য অস্ত, কিন্তু পুর্ব্বে চন্দ্রমা উঠে এসে সন্ধ্যার আগত অন্ধকার ও আমাদের মনের মধ্যের ভয়ের অন্ধকার সরিয়ে দিলেন। কমলসিং বার বছর পূর্ব্বে এপথে এসেছে, এখন কি তার এই দিকশূন্য স্থানে দিক ও পথ মনে আছে? তাকে জিজ্ঞেস করলুম "কমলসিং ঠিক যাচ্ছি ত?" সে কিছু না বলে চলে চল্‌ল। আমরাও চললুম। তার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। তবে এদিকে প্রকৃতি শান্ত, ওধারে মনে যে ভীষণ সন্ত্রাস এসেছিল তা নেই, ভীষণ বিপদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছি।

দূরে, খুব দূরে যেন গোধুলির মত দেখা গেল। কমলসিং কে দেখিয়ে বললুম "তাহলে গো মেষের সঙ্গে মানুষও আছে, তুমি জোরে ডাক দাও, তাদের দাঁড়াতে বল।"

কমলসিং ডাক দিল, কিন্তু কোথায় তাহারা আর কোথায় আমরা। আমাদের ডাক ওদের কাছে পৌঁছয় না। তবু

মনে বল ও উৎসাহ এল। সামনে ত মানুষ আছে। আমরা তাহলে ঠিকই যাচ্ছি। একটা নদী এল। নদী অর্থে পিছনে লিপুর বরফ গলা জলের স্রোত। স্রোতের ধার দিয়ে চললুম। সম্মুখে জ্যোৎস্না এবং গাছপালা একেবারে না থাকায় বাঁদিকের পাহাড় থেকে সূর্য্যাস্তের আভা প্রতিফলিত হয়ে আসছে। কতকক্ষন পরে সামনে একটা ঘরের মত দেখা গেল। গিয়ে দেখি খাণিকটা ঘেরা স্থানের মধ্যে একধারে গোয়ালের মত দুখানা ঘর তার ভিতরে ও বাইরে কতকগুলি ভেড়া ছাগল ও জব্বু। অপর ধারে দুটি ঘর, একটির ভিতর থেকে আলো আসছে। ভিতরে গেলুম। যেখানে আগুন জ্বলছে, তার চারদিকে কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ বসে। আগুনের উপর কেটলি বসান। তাদের হাতে কাপ (cup), তাতে ছাতু। কেটলি থেকে চা নিয়ে কাপে ছাতু ভিজিয়ে চামচে দিয়ে খাচ্ছে। এদের হঠাৎ দেখলে কে মেয়ে কে পুরুষ যেন চেনা যায় না। উভয়ের মাথায় বড় চুল, আর উভয়ই গোঁফ দাড়ি শূন্য। এরা খাম্পা। তিব্বতের শুকনো বাতাসে এদের গোঁফ দাড়ি গজায় কম। হাত দিয়ে গোঁফ দাড়ি ছিঁড়তেও দেখেছি। কৈলাশ পতি শিবের মূর্ত্তিতে তাই বোধ হয় গোঁফ দাড়ি দেখা যায় না।

এ জায়গাটার নাম পালা, কালাপানি থেকে ১৬ মাইল, উচ্চতা ১৪,০০০ ফুট। আমরা আজ ১২০৮০ ফুট থেকে ১৬৭৫০ ফুট উঠে আবার ১৪০০০ ফুট-এ নেবে এসেছি।

ভিতরে গিয়ে আমরা আগুনের ধারে বসলুম। আমাদের

তারা যা খাচ্ছিল ছাতু আর চা দিতে চাহিল কিন্তু মা ও আমি নিলুম না, কমলসিং নিল। তাদের কথা ভাষা আমরাও বুঝলুম না, তারাও আমার হিন্দি বুঝল না। কমলসিং কিছু কিছু বোঝে। তাকে দিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করালুম যে আমাদের একটা কম্বল দিতে পারে কিনা। তারা বলিল হ্যাঁ, তবে রাত্রি দুটোর সময় তাদের কম্বল দিয়ে দিতে হবে কারণ সেই সময় তারা রওয়ানা হবে। এরা লিপুর দিকে যাবে। এরা লিপু দিয়ে এপার ওপার ব্যবসায়ীদের মাল নিয়ে যায়। এরা রাত্রে দুটা তিনটার সময় রওয়ানা হয়ে অতি ভোরে লিপু পার হয়। লিপু পার হবার সেই ঠিক সময়, কারণ মধ্যাহ্নের পর প্রায়ই লিপুর উপর ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। তাছাড়া রোদ উঠলে লিপুর উপর বরফ নরম হয়, গলতেও থাকে, সে সময় যাওয়া বিপজ্জনক।

তাদের দেওয়া কম্বলখানা নিয়ে আমরা পাশের ঘরটায় গেলুম। এ ঘরেও প্রবেশ দ্বারে পাল্লা নেই, আর ছাদে খাণিকটা ফাঁকা খোলা যেমন এখানে হয়, ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিলে ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার জন্য। আমার ছাতাটা খুলে ছাদের ফাঁকটা যথাসম্ভব ঢাকলুম। সঙ্গে আনা যা কিছু পুরি ছিল তাই মা খেতে দিলেন, নিজে খেলেন না। জল নেই। বাহিরে কিছুদূরে যে নদী আছে সেখানে গিয়ে নেবে রাত্রে ঠাণ্ডায় কে জল আনবে। আমিও যেতে পারব না, কমল সিংকেও বলা ঠিক নয়। সঙ্গে আনা পাতলা আলোয়ান বালির

মেঝেতে পেতে ওদের দেওয়া কম্বল গায়ে দিয়ে আমরা শুয়ে পড়লুম। কোন কাপড় চাদর নেই যে খোলা প্রবেশ দ্বারে বেঁধে বাইরের ঠাণ্ডা আটকাই। কমলসিংও শুয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা বেলে মেঝের উপর শোয়া, গায়ে একটা পাতলা কম্বল, উপরে খোলা ছাদের উপর একটা ছাতা রেখে ঠাণ্ডা আটকাবার চেষ্টা, পাশেও মুক্ত অবারিত দ্বার, তাতেও ঠাণ্ডা আটকাবার কোন আড়াল নেই। শুকনো পুরি খেয়ে জল খাইনি, মা ত কিছুই খাননি, সেই সকালে কালপানিতে অল্প যা কিছু খাওয়া ছাড়া। তবুও ঘুমিয়ে পড়লুম।

মাঝরাতে খাম্পারা ডাক দিল। উঠে দেখি তারা কম্বলটা চায়। তাদের মালপত্র বেঁধে পশুদের উপর বোঝাই করছে। তাদের কম্বলটা দিয়ে ফিরে এসে মেঝেয় পাতা আলোয়ানটা তুলে ঝেড়ে তাই গায়ে দিয়ে আবার শুলুম। ঘুম কোমল আরামপ্রদ বিছানার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে শারিরীক সুস্থতা ও মানসিক নিরুদ্বেগতার উপর ও শারিরীক পরিশ্রম ও ক্লান্তির উপর।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ফরসা হয়েছে। কমলসিংকে ডাকতেই সে উঠে পড়ল। বেশ ঠাণ্ডা হলেও রাত্রে বিনা আচ্ছাদনে খোলা জায়গায় শুয়ে থাকার দরুণ তেমন ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল না। দাঁড়িয়ে পড়লুম। কেবল ছাতি ভিন্ন আর কিছুই তুলে নেবার নেই। বাহিরে একটু গিয়ে নদীর ধারে নাবলুম। ওঃ, কি ঠাণ্ডা বরফগলা জল। কিন্তু প্রাতঃকৃত্যাদি

সারতে হবে। তারপর চললুম তাকলাকোটের দিকে। খাবার কিছুই নেই। পথ প্রায় সমতল, চড়াই নাবাই নেই। মার চব্বিশ ঘণ্টা কিছু খাওয়া হয়নি। তাকলাকোট এখনও বেশ দূর, পাঁচ ছয় মাইল হবে। মা কি করে যাবেন ভাবছিলুম, এমন সময় কমলসিং নিজে থেকেই বল্‌লে সে মাকে পিঠে নেবে। পিঠের উপর ঝুলে যাওয়া মোটেই সুখের নয়, তবে উপায় কি। একটু রোদ উঠতে মা নেবে চললেন। একটা চাষ করা ক্ষেতের পাশে এসে দেখি কড়াইসুটি হয়েছে। কমল সিংকে পয়সা দিয়ে পাঠালুম যদি কিছু কড়াইসুটি পায়। আরও বলে দিলুম যদি দুধ পায় তাও আনতে। কমলসিং কড়াইসুটি নিয়ে এল, সঙ্গে তার একজন লোক এলুমিনিয়ামের একটি ছোট ডেকচিতে দুধ এনেছে। ডেকচির বাইরেটা কাল, ভাল মাজা পরিষ্কার নয়, তা দেখে মা দুধ নিলেন না। আমরা কড়াইসুটি খেতে খেতে চললুম।

আকাশ পরিষ্কার। বেশ রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। তিব্বতে যতই ঠাণ্ডা হোক রোদ উঠলে আর তেমন ঠাণ্ডা বোধ হয় না। রোদ প্রখর, রোদে চলতে কখন কখন এমন কি ঘাম হয়, গরম বোধ হয়।

তাকলাকোটে পৌঁছলুম। তাকলাকোট ভোটিয়াদের এক বড় ব্যবসাকেন্দ্র। এখান থেকে তারা তিব্বতের অভ্যন্তরে অনেক দূর দূর জায়গায় যায় এবং উল ক্রয় করে। এখানে একটা লামাদের বড় মঠ আছে। Simling Gompa সিমলিং গোম্পা। বিরাট মঠ। অনেক লামা এতে থাকেন। এর শাখা মঠ আট নয়টি মানস সরোবর, রাক্ষস তাল ও অন্যস্থানে আছে। নতুন লামাদের শিক্ষার জন্য এর মধ্যে স্কুল আছে। বই পুঁথিও এখানে অনেক আছে। তার মধ্যে দুখানা বই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। একখানার নাম Kanjur যাহাতে বুদ্ধের বাণীর অনুবাদ আছে, আর একখানা Tanjur প্রায় ২৩৫ খণ্ডে লেখা যাহাতে কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতিষ, তন্ত্র, মন্ত্র নানা বিষয় আছে। প্রাচীন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ যাহা মধ্য-পশ্চিম এশিয়ার তুর্কি মুসলমান আক্রমণ-কারীদের হাতে ধ্বংস হয়েছে তাহার তিব্বতী অনুবাদ আছে। আছে বলা ঠিক হবে না, ছিল। কারণ তিব্বতের আধুনিক চীনা অধিকারীরা এইসব মঠের কত অমূল্য গ্রন্থ যে ধ্বংস করেছে তার ঠিক নেই। এইরূপ ধ্বংস নাকি সভ্যতার অগ্রগতির উপায় আর এইরূপ ধ্বংস করার প্রবৃত্তিই সভ্যতার লক্ষণ ও পরিচায়ক।

তাকলাকোটে পৌঁছে খোঁজ করিয়া দলীপসিংয়ের বড় ভাই নন্দরামের ঘরে গেলুম। এদের ঘরের উপর canvas-দিয়ে ঢাকা আর দেয়াল পাথরের। পাথর গাঁথা নয়, একের উপর এক রাখা। এইরকম একটা ঘরের কাছে, তবে একটার সহিত আর একটা লাগা নয়, ঠেকাঠেকি নয়, ঐরকম আরও তাঁবুর ঘর। অক্টোবরের শেষেরদিকে বা নভেম্বরের গোড়ায় এইসব ঘর বন্ধ করিয়া ভোটিয়ারা নিজের দেশে গারবিয়াং ও আরও নীচে নীচে ধারচুলা ও অন্যান্য স্থানে চলিয়া যায়।

১৪

নন্দরাম গারবিয়াংয়ের দলীপসিংয়ের বড় ভাই। ইহারা চার ভাই। নন্দরামের নামে ধারচুলার প্রেমবল্লভ বাবু আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি দিতে নন্দরাম সযত্নে আমাদের বসাইল ও আমাদের জিনিষপত্র কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। আমি সব কথা বললুম। কিভাবে কালাপানি থেকে এসেছি, লিপুর উপর ঝড়-বৃষ্টির মুখে পড়েছি ও তারপর কিভাবে পার হয়েছি ইত্যাদি তাকে বললুম। খচ্চর সঙ্গে থাকলে এসব কষ্টে বিপদে পড়তে হত না। নন্দরাম রেগে বলিল "খচ্চরওয়ালা তোমাদের এরকম ধোকা দিয়েছে? তারা আসুক এরজন্য তাদের যা বলবার করবার করব।" তারপর সে বললে "তোমাদের কাল থেকে খাওয়া হয়নি, চল আমি খাওয়ার

ব্যবস্থা করে দি।” এই বলে সে আমাদের তার ঘরের নিকট একটা খালি ছোট তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে বসাল এবং নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে রান্নার কিছু বাসন, চাল, আলু, কাঠ ইত্যাদি পাঠিয়ে দিল। এইসবের জন্য সে কোন মূল্য নিল না। যাত্রীর প্রথম আহারের সামগ্রীর মূল্য সে নেয় না। ঐ অঞ্চলে অন্যত্রও এ রকম দেখেছি যাত্রীদের সাহায্য করিতে ও তাদের নিকট প্রথম আহারের সামগ্রীর মূল্য না নিতে।

আহারান্তে সে আমাদের থাকবার আর একটি অপেক্ষাকৃত বড় ঘরে নিয়ে গেল। এ ঘরের একধারে একটি ছাগল বাঁধা ছিল। এখানে মাকে বসিয়ে আমি নন্দরামের সঙ্গে গেলুম কৈলাশ যাবার ব্যবস্থা করিতে। সে বলিল “তোমরা যদি দুদিন আগে আসতে ত সুসার নারায়ণস্বামীর সহিত তোমাদের পাঠিয়ে দিতুম। তিনি কাল তাঁহার দল সহ গেছেন। এখন তোমরা একলা কি করে যাবে? ঐদিকে ডাকু এসেছে, ওখানকার লোক সব পালাচ্ছে, তোমরা কি করে যাবে?”

“এতদূর এসে কৈলাশ দর্শন হবে না, সে কি করে হয়? যে কোন রকমে একটা ব্যবস্থা করুন।”

“দেখি কি করা যায়” বলে নন্দরাম কয়েকজন খাম্পাদের ডাকিল।

নন্দরাম এখানে একজন বিশিষ্ট লোক, তাহার প্রতিপত্তি (influence) ও যথেষ্ট। আমি নন্দরামকে বললুম যে

আমার দুটো খচ্চর বা জব্বু (mule বা yak) চাই। একটা মার জন্য ও আর একটা জিনিষপত্রের জন্য। কয়েকজন খাম্পা এল, কিন্তু কৈলাশের নিচে দারচিনের নিকট ডাকাত হুনিয়ারা এসেছে, এরকম খবর এসেছে সেজন্য তারা যেতে প্রস্তুত নহে। এই সময় পশ্চিম অঞ্চল থেকে দলে দলে সশস্ত্র হুনিয়া লাদাকের দিক দিয়ে তিব্বতে ঢুকে আসে ও লুট-পাট করে। এই হুনিয়াদের (Huniya) আক্রমণে নিরস্ত্র তিব্বতীরা বসবাস ছেড়ে পালায়। অতঃপর একজন রাজী হল। নন্দরাম তখনি অগ্রিম দশটা টাকা তাকে দিতে বলিল। আমি দিয়ে দিলুম। পরদিন সকালে আটটার সময় সে দুটি yak আনিবে বলে গেল। আমাদের খচ্চরওয়ালারা বিকেলে এসে পৌঁছিল। আমি আমাদের ঘরে গিয়ে মাকে বললুম কাল সকালে আটটার মধ্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তারপর আমরা রান্নার আয়োজন করলুম। কমলসিংকে দিয়ে কিছু দরকার মত জিনিস নন্দরামের দোকান থেকে আনালুম। এখানে কাঠ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য, ভেড়া ছাগল নাদি দিয়ে কিংবা স্থানে স্থানে একরকম ছোট ছোট গাছ পাওয়া যায়, যাকে বলে দামা, তাই দিয়ে রান্না করে। এ গাছ কাঁচা কেটে আনলেও জ্বলে। ঘি আটা গারবিয়াং থেকে এনেছিলুম। মা আটা মেখে হাতে বেলে পুরি ভাজলেন। সকালের জন্য কিছু রাখলেন তারপর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে আমাকে ও কমলসিংকে খেতে বসতে বললেন। আমাদের খাওয়াবার পর নিজে বসলেন। খেয়ে কমলসিং শুয়ে পড়ল,

আমরা কম্বল জড়িয়ে খানিকক্ষণ বসলুম। কিছু পরে যার ছাগল বাঁধা ছিল সে এল ও ছাগলটার পাশেই একটা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। পরস্পরের ভাষা না জানায় দুচারটে কথা ছাড়া কথাবার্ত্তা হল না। খুব ঠাণ্ডা, আমাদের বালাপোষ ও কম্বল ছিল তাতে হয় না। সেই দুখানা এক করে ঢাকা দিয়ে আমরা শুয়ে পড়লুম। সকাল সকাল উঠে প্রস্তুত হতে হবে। ভোরে ঠাণ্ডায় দূরে খোলা মাঠে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে প্রাতঃকৃত্যাদি সারা যে কি ব্যাপার তাহা এখনও মনে আছে। তবে এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে, পরেও অনেকবার হয়েছে।

১৫

সকালে আমরা সেরে সুরে জিনিষপত্র বেঁধে বসে আছি, জব্বুওয়ালা আসে না। কমলসিংকে জিজ্ঞেস করলুম সে বল্ল আসবে। তাছাড়া আর সে কি বলবে। আমরাও যা জানি সেও তাই জানে। উদ্বিগ্ন হয়ে পথ চেয়ে বসে রইলুম। রোদ উঠেছে, ঘরের ভিতরও একটু রোদ এসেছে। খাণিক পরে সে এল। তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালুম কিন্তু সে হাত বাড়িয়ে দশ টাকা যা আগের দিন নিয়েছিল তা ফিরিয়ে দিয়ে বলিল যে সে যাবে না। মানস সরোবরের ধারে হুনিয়াদের আসার খবর এসেছে, সেজন্য তার বাবা তাকে যেতে দেবে না। আমি তাকে নিয়ে নন্দরামের কাছে গেলুম। নন্দরাম সব শুনে বলিল

"কৈলাশের দিক থেকে সব পালিয়ে আসছে, ওদিকে কেহ যাবে না। তোমাদের কৈলাশ যাওয়া অসম্ভব। তবে মানস সরোবরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব তীরে ঠোকরমণ্ডি, সেখানে আমার দোকানে আমার ছেলে আছে। ঐদিক দিয়ে হুনিয়ারা আসছে সেজন্য ছেলেকে নিয়ে আসবার জন্য কাল লোক পাঠাব। তোমরা এদের সঙ্গে ঠোকর যাও। সেখানে মানস সরোবরে স্নানও হবে আর ওখান থেকে ওপারে কৈলাশ দর্শনও হবে। তবে যথা সম্ভব কম জিনিষপত্র নিয়ে যেও। তাঁবু ও আর যা পার এখানে রেখে যাও। আমি ঠোকর থেকে আমার জিনিষ আনবার জন্য জব্বু পাঠাব, দেখি কটা জব্বু পাই।"

আমি বললুম "একটা জব্বু আমার মার জন্য চাই, আর একটা জিনিষের জন্য।"

মাকে গিয়ে সব বললুম। জিনিষ রেখে যাবার মত আমাদের বিশেষ কিছুই ছিল না তাঁবু ছাড়া। তাঁবু বিশেষ দরকার কারণ এখানে দোকান চটি নেই, খোলা মাঠে রাত কাটাতে হয়। তবে উপায় নেই, নন্দরাম তাঁবু রেখে যেতে বলেছে। তাঁবু ছাড়া আর কি রেখে যাব? আমাদের সঙ্গে ছিল মাত্র একখানা কম্বল, তাও তেমন গরম নয়। আর ছিল মার সেলাই করা পাতলা দুখানা বালাপোষের মত। গায়ে আমার একটা পুরো-হাতের সোয়েটার ও তার উপর একটা কোট, মারও প্রায় ঐরূপ। আর ছিল দু-তিনটে করে জামা আর তিন চারখানা করে কাপড়। রান্নার বাসনও যথাসম্ভব কমই ছিল।

আজকের মত পরের দিনও সকাল সকাল উঠে প্রস্তুত হয়ে বসলুম। মনে উদ্বেগ আজ কি হয়। আজ কিন্তু জব্বু নিয়ে লোকটা এল। উৎসাহের সহিত আমরা উঠে নন্দরামের কাছে গেলুম। সে তখন জব্বুওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে। পাঁচ ছটা জব্বু দাঁড়িয়েছিল। এ কয়টায় তার সব মাল ঠোকর থেকে আনা যাবে না, কিন্তু এখানে আর জব্বু পাওয়া যাচ্ছে না। পথে বা ঠোকরে আরও জব্বু নিয়ে নিতে তাকে বলে দিল ও তার ছেলেকে একখানা চিঠি লিখে দিল। আমার বিষয়ও আর একখানা চিঠি ছেলেকে লিখে সে চিঠি আমাকে দিল।

১৬

জব্বুর বোঝা এখানে কিছুই ছিল না। একটিতে কেবল মা বসিলেন আর একটিতে আমাদের জিনিষ রাখা হল। তারপর আমরা রওয়ানা হলুম। আকাশ পরিস্কার, রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা মাঠের ওপর দিয়ে চলেছি। হিমালয়ের মত এখানে দুধারে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সরু পথ নয়। এখানে অল্প উঁচু-নিচু বিস্তৃত মাঠ, যেন কতকটা মরুভূমির মত। সবুজ মাঠ, চাষবাস ক্বচিৎ কখনই চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলের ধারা পার হবার সময় জব্বুওয়ালা আমাকে একটা জব্বুতে বসাইল। জব্বু বেশ শান্ত, ধীরে ধীরে চলে, তবে তার উপর চাপিবার সময় শিং নেড়ে সরে সরে যায়।

আমরা বেশ খাণিকটা যাবার পর একটা ছোট গ্রাম এল। নাম টয়ো (Toyo). গ্রাম অর্থে দুচারখানা ঘর। কিছু ছাগল ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। আজ এইখানেই থাকা। জব্বুদের চরতে ছেড়ে দেওয়া হবে। একজনের ঘরে আমাদের ব্যবস্থা হল। লম্বাটে ঘর, দুভাগ করা। ভিতরের দিক আমাদের দেওয়া হল। মাঝখানে আগুনের জায়গা, তার উপরে কাঠের ছাদে ধোঁয়া বেরোবার জন্য খোলা। কমলসিং আমাদের জিনিষ ভিতরে নিয়ে এল। ঘরের ভিতর হাওয়া নেই, তেমন ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল না। তারপর তিনটে পাথর নিয়ে তার উপর রান্না আরম্ভ হল। রান্না বলতে ত তিনজনের মত খানকতক পুরি ভাজা। সকালের জন্যও কখানা রাখা হল। নিকটে একটি সরু ঝরণা ছিল। বাহিরে এমন ঠাণ্ডা হাওয়া যে খাওয়ার পর বাহিরে হাত ধুতে যাওয়া অসম্ভব। রান্নার আগে কমলসিং যে জল এনেছিল সেই জলেই হাত মুখ ধুয়ে নেওয়া হল।

সকালে যখন রওয়ানা হলুম তখন রোদ উঠেছে। তিব্বতে পরিষ্কার আকাশ আমার বড় ভাল লাগত। রোদ উঠলেই ঠাণ্ডা বাতাস সত্ত্বেও বেশ লাগে। আমরা উঁচু নিচু ঢালু ময়দানের উপর দিয়ে চলেছি। মাইলের হিসেব নেই, চলে চলেছি। সামনে একটা পাহাড়, ঢালু জমির উপর দিয়ে উঠতে লাগলুম। বিস্তৃত পাহাড় আকাশে এক দিক থেকে আর এক দিক পর্য্যন্ত রেখা কেটে রেখেছে। এ পাহাড়ের নাম গুরলা

(gurla)। পাহাড়ের উপর পাস (pass) যেখান থেকে পার হওয়া যায় তাহাকে লা (la) বলে। ক্রমান্বয়ে উঠে চলেছি। বালি ও মাঝে মাঝে পাথর। কি একরকম ছোট ছোট গাছও মাঝে মাঝে আছে। উঠতে উঠতে এসে পড়লুম গুরলা লা (gurla pass)র উপর। উচ্চতা ১৬২০০ ফুট। এর সামনে যা দেখলুম তা কখন ভুলতে পারব না, আর মনে যে কি এক আবেগ এল তা বলতেও পারব না। সামনে কৈলাশ, ঠিক শিবলিঙ্গ। শুভ্র তুষার মণ্ডিত; দুধারে নিচু পর্ব্বত মালা। নিচে মানস সরোবর ও রাক্ষসতাল। দুই সরোবরের মাঝ দিয়ে অল্প উচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়ে কৈলাশ যাইবার পথ। মা জব্বু থেকে নেবে পড়লেন ও আমরা এবং আর সকলেই সাস্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে কৈলাশকে প্রণাম করলুম। সে প্রণাম করে যেন মন ভরে না। উঠে আবার এক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কতদিনের আকাঙ্ক্ষার পুরণে মন গভীর আবেগে ভরে উঠল। পিছনে স্বচ্ছ নীল আকাশ, তার উপর এই বৃহৎ শিবলিঙ্গ। অপূর্ব্ব দৃশ্য। camera দিয়ে এ ছবি তোলা যায় না, মনের উপরই ইহা গভীরভাবে অঙ্কিত হতে পারে। camera-র ফটো ফিকে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, মনে যে ছবি অঙ্কিত হয় তা গভীরতরই হতে থাকে। কতদিন হয়ে গেছে, কিন্তু আজ লেখবার সময় সামনে সেইরকমই সেই দৃশ্য, সেই ছবি, সেই অপূর্ব্ব শিবলিঙ্গ দেখছি যেমন সেদিন দেখেছিলুম। একটুও সে দৃশ্য ম্লান হয়নি। কৈলাশের ফটো

যাঁহারা দেখেন তাঁহারা দেখেন যেমন তাঁহারা সিনেমার পর্দ্দায় বা ছবির বইতে দৃশ্য দেখেন সেইরকমই একটা দৃশ্যের মত। দেখিবার সময় যে অবর্ণনীয় আবেগ সেদিন আমাদের মনে এসেছিল সে আবেগ তাঁদের মনে আসে না, আসতেও পারে না। সেইজন্য তাঁহারা সত্যকার জাগ্রত কৈলাশ দেখেন না। দেখেন মাত্র একটা পাহাড়ের দৃশ্য যে পাহাড়ের শৃঙ্গ শিবলিঙ্গের মত।

যেমন কৈলাশ সেইরকম অপরূপ মানস সরোবর আর রাক্ষসতাল। মানস সরোবর পঞ্চান্ন মাইলের অধিক ঘেরা হ্রদ। উত্তরে কৈলাশ ও কৈলাশের পর্ব্বতমালা, দক্ষিণে বিস্তৃত সৈকত, তার পিছনে অভ্রভেদি তুষারমণ্ডিত মান্ধাতা। পূর্ব্বে যতদূর দেখা যায় ছোট ছোট পর্ব্বত তরঙ্গ, পশ্চিমে ক্ষীণ পর্ব্বত আড়ালে বিস্তৃত রাক্ষসতাল। এই মানস সরোবরের দৃশ্যও কেবল ফটোতে দেখবার নয়, অনুভবের, যে অনুভব গুরলা লার উপর দাঁড়িয়ে নিবিষ্টমনে চেয়ে থাকলে হয়। রাক্ষসতালও এইরূপ অপরূপ, কেবল তার পরিধি মানস সরোবরের চেয়ে কিছু কম। মানস সরোবরের তট চারিধারেই একরকম সোজা, সেজন্য উপর থেকে কতকটা চতুঃষ্কোণের মত দেখায় কিন্তু রাক্ষসতাল সেরকম নয়, কোথাও সরু কোথাও বিস্তৃত।. রাক্ষসতালের মধ্যে দুইটি দ্বীপও আছে। রাবণরা তিন ভাই এর উপকূলে তপস্যা করেছিলেন সেইজন্য এর নাম হয়েছে রাক্ষসতাল। মানস সরোবর ব্রহ্মার সৃজিত।

জলের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি এই সরোবর সৃজন করেন মানসিক শক্তি দিয়া।

জব্বুওয়ালারা চলিতে বলিল। মাকে জব্বুতে বসাইল। পথ নিচে মানস সরোবরের তট পর্য্যন্ত গড়িয়ে চলেছে। আমরা উত্তরে কৈলাশ অভিমুখে না গিয়ে মানস সরোবরের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে পূর্ব্ব মুখে চলিলাম ঠোকরমণ্ডিতে। ঠোকরমণ্ডি মানস-সরোবরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোনে। গুরলা-লা থেকে মানস সরোবরের তটে নেবে এলুম। বিস্তৃত বালির সৈকত। এগিয়ে চললুম। সামনে দেখি লোকের জনতা। বড় আশ্চর্য বোধ হল। এখানে এ জনতা কেন। ঠোকরের দিক থেকে ক্রমান্বয় নরনারী সারি দিয়ে চলে আসছে। তাদের সঙ্গে ছেলেমেয়ে, জব্বু, ভেড়া, ছাগল, মোট, বোঝা, সবই আছে। আরও কাছে এসে দেখলুম তাদের মুখেচোখে ভয়, সন্ত্রাস, ব্যাকুলতা। জব্বুওয়ালা এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা কয়ে এসে বলিল "ডারচিন হয়ে মানস সরোবরের উত্তরে ডাকাত আসছে, সেদিক থেকে গ্রাম ছেড়ে এরা সব পালিয়ে এসেছে, তোমরা শীঘ্র মানস সরোবরে স্নান করে নাও, এখনি পালাতে হবে।" আমি ব্যগ্র হয়ে বললুম "এখনি কি করে ফিরব? সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, জোর তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস, এখন মানস সরোবরের জলে নেবে কে স্নান করবে?" জব্বুওয়ালা আমার কথায় কান দিল না, সে তখন ব্যগ্র, ত্রস্ত। যারা চলে আসছে তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে আরও ডাকাতদের বিষয়

জানিতে লাগিল। তারা কতজন, কোন্‌দিক দিয়ে আসছে, মারছে, ধরছে, কেড়ে নিচ্ছে, কি করছে। যতই শুনছে ততই তার মুখে ভয়, উদ্বেগ, চঞ্চলতা বেড়ে উঠছে। জব্বুদের জোরে হাঁকিয়ে চলল ঠোকরের দিকে। যতই আগে যাচ্ছি ততই দেখছি সামনে থেকে আরও লোক পালিয়ে আসছে। ছেলে-মেয়ে যে যা পেরেছে নিজেদের মোটঘাট নিয়ে ক্রমান্বয়ে চলে আসছে। ঠোকরমণ্ডীতে আরও ভীড়। এখানে একটা মঠ, বাহিরে সরোবরের ধারে অনেকগুলি ভোটিয়াদের ঘর, কিন্তু ঘরগুলি খালি, কেহই তাতে নেই, কেবল ঐদিক দিয়ে কুকুরের ডাক আসছে। আমি এক জায়গায় জব্বু থেকে জিনিষ নাবিয়ে মাকে ও কমলসিংকে দাঁড়াতে বলে নন্দরামের ছেলের সন্ধান করলুম। নন্দরাম তার নামে যে চিঠি দিয়েছিল তাই নিয়ে মঠের ভিতর ঢুকলুম। সেখানে লোকের এত ভীড় যে ভিতরে যাওয়াই কঠিন। মঠ চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, প্রবেশের একটিমাত্র ফটক। প্রাঙ্গনের একধারে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে একটা ছোট ছাদ পার হয়ে একটা ঘরে ঢুকলুম। জিজ্ঞেস করতে করতেই এখানে এসেছি। এখানে নন্দরামের ছেলে নেপালসিংকে পেলুম। সে স্কুলে কয়েক ক্লাশ পড়েছে, ইংরিজি কিছু জানে। নন্দরামের চিঠি তাকে দিলুম, সে খুলে পড়ে বললে "আমি কি করব? এখান থেকে সকলে পালাচ্ছে আর তোমরা এখানে আসছ।"

সে তখন বড় ব্যস্ত ও উত্তেজিত। তার পাশে একটা

কৈলাশঃ নন্দিগোম্ফা হইতে

[*Photo by*—SWAMI PRANABANANDA
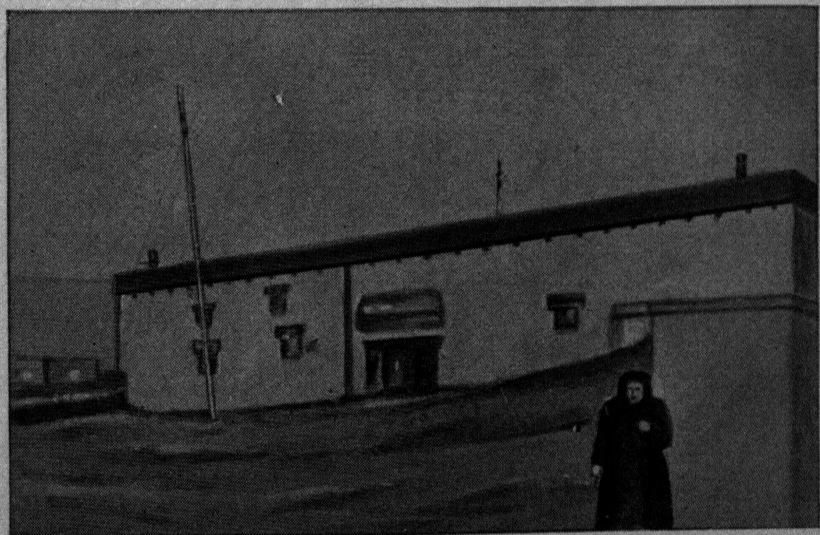
ঠোকর মণ্ডি

[*Photo by*—SWAMI PRANABANANDA

রাক্ষস তাল

[*Photo by*—SWAMI PRANABANANDA
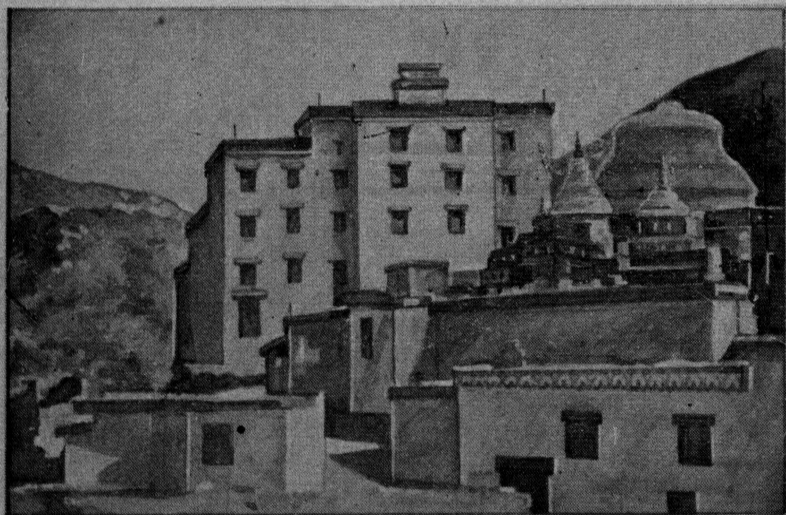
লামিউরু গোম্ফা

[*Photo by*—SWAMI PRANABANANDA

বন্দুক আর পিছনে কয়েকটা package. আমি বললুম, "তোমার বাবা বন্দোবস্ত করে পাঠিয়েছেন।"

"বাবা পাঠিয়েছেন কিন্তু আমি কি করব? আমিই ত ঘর ছেড়ে এখানে এসেছি। সকলেই ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। আমার ঘরে গিয়ে তোমরা থাক।" আমি বললুম, "সেখানে ত কেউ নেই, আমাদের এ মঠেই থাকা ভাল।"

"না, তোমার মা আছেন, মঠে স্ত্রীলোক থাকতে পারে না।"

"আমার মা ত মা, স্ত্রীলোক নন, সকলেরই উনি মা।"

"না, মঠে লামাদের কড়া নিয়ম, কোন স্ত্রীলোককে সন্ধ্যার পর এখানে থাকতে দেওয়া নিষিদ্ধ। তোমরা আমার ঘরে গিয়ে থাক।"

আমি নেবে এলুম। নেপালসিংয়ের ঘর জেনে সেখানে গিয়ে আমরা বসলুম। মাইল চৌদ্দ আমরা এসেছি, পথে কিছু খাওয়া হয়নি। বোজকা বুজকি খুলে রান্নার জোগাড়ে লেগেছি, মা পাথর সাজিয়ে উনুন করছেন এমন সময় জব্বুওয়ালারা জব্বু নিয়ে এসে বল্‌লে, "চলো, চলো, অভি যায়েগা, ডাকু আতা।"

তাদের মুখে, কথায়, ভয়, উত্তেজনা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলুম। মাকে বললুম মা কি করবে? জিনিষপত্র খোলা

হয়েছে, সেসব গুটিয়ে বেঁধে ছেঁধে নিতে সময় লাগবে। সকলেই পালাচ্ছে, চারিদিকে ভয় উত্তেজনা। যেখানে বসে আছি তার আশেপাশে কেহ নেই, সবাই ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। দূর থেকে পালিয়েও ক্রমান্বয় লোক আসছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মঠে নেপালসিং আর কজন লামা ব্যতিরেকে অল্পক্ষণের মধ্যে আর কেহ থাকবে না, শূন্য হয়ে যাবে। মাকে বললুম মা চল, কিন্তু আমাদের ইতস্ততা ভাঙ্গবার আগেই জব্বু ওয়ালারা চলে গেল। কমলসিং ভীত হয়ে বলিল, "তোমাদের কেবল খাওয়া খাওয়া, ডাকু এলে কি করব ?" আমি বললুম, "কমলসিং, তুমি ইচ্ছে কর ত ওদের সঙ্গে চলে যেতে পার, আমাদের জন্য তোমাকে আট্‌কাব না। তবে যিনি বাঁচাবার তিনি এখানেও আছেন। সেই কৈলাশ-পতিকে স্মরণ করে এখানেই থাকতে পার।"

কমলসিং তাহাই করিল, গেল না। ফিরে যাওয়াও অত্যন্ত কঠিন ছিল। চৌদ্দ মাইল এসে সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় ও অন্ধকারে কিছু না খেয়ে আবার তখনি চৌদ্দ মাইল হেটে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ভয়ে উত্তেজনায় আমিও ব্যস্ত হয়ে বলেছিলুম মা চল। কিন্তু যাওয়া যে সম্ভব ছিল না তা তখন ভাবিনি, ভাবা তখন সম্ভবও ছিল না। কমলসিং কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল, তারপর রান্নার জল আনতে গেল।

রান্না খাওয়ার পর নেপাল সিং-এর ঘরে ঢুকলুম। ভিতরে দুটো বড় বড় package বোজকা ভিন্ন আর কিছু ছিল না।

ঘরটা বড়ই। দরজা বন্ধ করিবার একটা ঝাপানের মত, সেটা লাগিয়ে কমলসিং দরজা বন্ধ করিল। হুহু করে বাতাস আসছে। ঝাপানের পিছনে ঐ দুটো বোজকার একটা টেনে এনে ঠেকনো দিতে কমলসিংকে বললুম। হ্যারিকেনর বাতিটা একটু কম করে রেখে আমরা বিছানা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। যে কম্বল ও বালাপোষ ছিল তা এক করে মা ও আমি তাই মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুলুম। ল্যাম্পের ওপাশে কমলসিং শুল। বললুম, "কমলসিং কৈলাশপতিকে স্মরণ করে শুয়ে পড়।"

দূর থেকে দু-একটা কুকুরের ডাক আসছিল, আর মাঝে মাঝে দু-চারজন লোকের গলা। সেই উদ্বিগ্ন স্বর যা বাইরে কিছুক্ষণ আগে শুনেছি। এখনও দূর থেকে লোকে পালিয়ে আসছে ও চলে যাচ্ছে। কিন্তু জব্ব্‌ওয়ালাদের চলে যাবার সময় যে রকম মনে ভয় উদ্বেগ এসেছিল, এখন সেরকম নেই, নিশ্চিন্ততা এসেছে। প্রথমে কিছুক্ষণ ঘুম আসছিল না, বোধ হয় ঠাণ্ডার জন্য কারণ গায়ের আচ্ছাদন তেমন ছিল না। কমলসিংএর নাকের ডাকে মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভয় উত্তেজনা এদের মনে যতই আসুক না, তার প্রতিক্রিয়া আমাদের মত তাদের মনে বেশীক্ষণ থাকে না সেইজন্য আমাদের মত তারা অভিভূত হয় না। কমলসিং শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার কখন ঘুম এসে গেছে জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঝাপানের বাইরে থেকে কে যেন বলছে দাই দাই, ধরম ধরম, আর কিছু বুঝতে পারলুম না। মনে হল

ডাকাত, চুপ করে রইলুম। দুচার বার ঐরকম কি বলে তারা চলে গেল। তখন সন্দেহ হল ওরা কি ডাকাত ছিল। ডাকাত হলে ঐরকম কবার ডেকে কি চলে যেত। ঐ রাত্রে আর কে হতে পারে। যারা পালাবার তারা ত পালিয়ে গেছে। হয়ত রাত্রে কেহ পালিয়ে এসেছে, আমাদের ঘরে আলো দেখে ডেকেছে রাত্রে এখানে থাকবার জন্য। কিন্তু যখন তার ডাকে চম্‌কে উঠেছি তখন এত কিছু ভাবিনি। ডাকাত বলেই মনে হয়েছিল। আত্মভয়ে লোকে বিচার বুদ্ধি হারায়। আত্মরক্ষা, স্বার্থরক্ষা ছাড়া আর তখন কোন কথাই তার মনে থাকে না। নীতিজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, কর্ত্তব্য, উচিত অনুচিত বোধ দ্বারা জীবের প্রকৃতিগত বৃত্তি কতকটা চাপা ও সংযত রাখা সম্ভব হইলেও তাকে উচ্ছেদ করা যায় না। ভিতরে চাপা থেকে যায়। বিপদ সন্মুখীন হলে স্বতঃই তাহা সক্রীয় হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষা জীব মাত্রেরই স্বভাবধর্ম্ম, ইহার দ্বারাই জীব নিজেকে রক্ষা করে। সৃষ্টির সঙ্গে প্রকৃতি জীবের মধ্যে এই বৃত্তি দিয়ে দেয়, তাকে রক্ষা করিবার জন্য। মানুধ মুখে যতই বলুক, যতই চেষ্টা করুক, যতই ধর্ম্মকথা পড়ুক বা শুনুক তার প্রকৃতিগত স্বভাব যায় না। আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষা বোধ ও চেষ্টা তার স্বভাবে অপরিহার্য্য ভাবে অন্তর্ভুক্ত। তবুও সে রাত্রে সেই কাতর ডাকে সাড়া না দেওয়ার জন্য তীব্র অনুশোচনা, নিজের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, আত্মরক্ষার্ত্ত অন্যের বিপদ ও কাতরতায় উদাসীন থাকার জন্য তীব্র আত্মগ্লানি মনে হলেই আজও মনের

ভিতর জ্বলে ওঠে। আর তার ঐ দু-চারটে কথা—দাই, দাই, ধরম ধরম—কানে বেজে ওঠে। পরে শুনে বুঝলাম দাই অর্থে ভাই। সে বোধ হয় এই বলছিল ভাই খুলে দাও, ধর্ম্ম হবে। তখন তাহা বুঝিনি। পরে যখনই বুঝেছি তখনই মনে তীব্র ক্ষোভ ও অনুশোচনা এসেছে।

সে চলে যাবার পর ঘুম আসে না, মনে অস্বস্থি। তারপর ঝিমুনি এসে গিয়েছিল কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার কার ডাক। এ ডাকে নম্রতা, কাতরতা নেই। জোর ডাক, সাড়া না পেয়ে আরও কড়া জোর ডাক। তারপর ঝাপানের উপর জোর আঘাত ও ঠেলাঠেলি। আমি কমলসিংকে বললুম দরজার পিছনে ঠেকনো দেওয়া বোজকা সরিয়ে নিয়ে দরজা খুলে দিতে। দরজা খুলতেই দুজন ছুটে ঘরে ঢুকে পড়ল। একজনের হাতে ছোট একটা লাঠি। তাই দিয়ে সে কমলসিংকে এক ঘা দিল, জোরে নয়, তবু কমলসিং মর গেয়া, মর গেয়া বলে শুয়ে পড়ল। তারা আর কোন দিকে না চেয়ে দেয়ালের পাশে দুখানা কম্বল পড়ে ছিল তাই নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি উঠে কমল সিংয়ের হাত যেখানে তারা মেরেছিল ঘসে দিলুম। সে শুয়ে পড়ল, আমিও শুয়ে পড়লুম। বুঝলুম এদের কম্বল ঘরে ছিল, তারা তা নিতে এসেছিল, কম্বল নিয়ে রাত্রেই পালাবে।

রাত কাটল। বাহিরে বেরিয়ে এলুম। সামনে মানস সরোবর, বিস্তৃত প্রশান্ত জলরাশি, একুল ওকুল যেন দেখা যায় না। ওপারে কৈলাশ পর্ব্বতমালা তার মধ্যস্থলে উচ্চ শৃঙ্গে শুভ্র তুষারাবৃত শিবলিঙ্গ। মা ও আমি এক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে সে সময় কোন ভাব, ভাবনা, চিন্তাই বোধ হয় ছিল না। সব যেন নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল। সামনে প্রকৃতিও নিস্তব্ধ, পাহাড়, জল, আকাশ সব স্তব্ধ, সময়ও অচল। ব্রহ্মা নাকি এই সরোবর সৃষ্টি করে তটে বসে ধ্যান করেছিলেন। একাগ্র ধ্যানের উপযুক্ত স্থানই বটে।

সরোবরে স্নানের জন্য এগিয়ে গেলুম, কিন্তু জল স্পর্শ করে পেছিয়ে এলুম। কি ঠাণ্ডা জল। তখন সূর্যোদয় হয়নি। কৈলাশকে প্রণাম করলুম। মা ঘিয়ের বাতি জেলে আরতি করলেন। ঘরে ফিরে মাকে বললুম আমি নেপালসিংয়ের কাছে হয়ে আসি।

মঠের বাহিরে কাল সন্ধ্যায়ে কত লোক ছিল এখন কেহই নেই। মঠ শূন্য। দু-চারজন লামা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখলুম না। উপরে উঠে গেলুম নেপালসিংয়ের কাছে। নেপালসিং বসে ছিল, আর কেহ নেই। সেও যাবার জন্য প্রস্তুত।

আমাদের ওর সঙ্গেই যেতে হবে। জব্বুর কথা বলতে সে বলিল "আমার জিনিষ নিয়ে যাবার জন্য আমিই ত জব্বু পাচ্ছি না, কি করব ?" আমি বললুম "অন্ততঃ একটা জব্বু দাও মার জন্য, জিনিষ পত্রের জন্য যদি জব্বু না পাওয়া যায় ত জিনিষ পত্র ছেড়ে দেব।" সে বলিল "অন্তত বারটা জব্বু আমার না হলেই নয়, আমি তারই চেষ্টা করছি ও তারই জন্য চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি। ওরা কটা জব্বু আনতে পেরেছে জানি না। বাহির গিয়ে দেখ কটা জব্বু এসেছে! যদি বারটার বেশি থাকে ত তুমি নিতে পার।"

আমি নিচে এসে বাহিরে মঠের পিছনে গিয়ে দেখি একটা দড়ি বাঁধা, তাইতে জব্বু এনে এনে বাঁধা হয়েছে। এক এক করে গুনে দেখি তেরটি জব্বু। নেপালসিং বলেছে বারটির বেশি থাকলে নিতে পার। বড় আশ্চর্য্য হলুম, ঠিক একটি বেশি জব্বু দেখে মনে হল যেন আমাদের জন্যই ঐ বেশিটি এসেছে। নেপালসিং কদিন থেকেই জব্বুর চেষ্টা করছিল। জব্বুওয়ালারা পালিয়েছে, জব্বু পাওয়া কঠিন। এক এক করে সংগ্রহ করছিল। আজ সকালেও সে জানত না যে বারটিও পাওয়া যাবে কিনা। অথচ আমি গুনে দেখলুম তেরটি রয়েছে, কি আশ্চর্য্য। মঠে ফিরে গিয়ে নেপালসিংকে বললুম তেরটি জব্বু রয়েছে।

"বেশ, একটা তুমি নাও।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম "তোমরা কতক্ষণে রওয়ানা হবে? আমরা সেইমত আসব।"

সে বলিল "ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রওয়ানা হব, তোমাদের ডেকে নেব।"

আমি ফিরে গিয়ে মাকে বললুম "চল আমরা আবার স্নান করতে যাই, এসে বেঁধে ছেঁদে নেব।"

তখন রোদ উঠেছে, বেশী ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না। স্নান করতে আর ভয় হল না। প্রথমটা জলে প্রবেশ করতেই পা যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল, তারপর সয়ে গেল। হাঁটু অবধি জলে নেবে স্নান করে উত্তরমুখী হয়ে কৈলাশপতিকে আবেগভরে প্রণাম করলুম। কতদিনের বাসনা, কতদিনের চেষ্টার পর, কত বাধা বিঘ্নের পর আজ মানস সরোবরে স্নান করে কৈলাশ দর্শন করছি। স্বপ্ন নয় সত্যই দেখছি এই মানস সরোবর, ঐ কৈলাশ। আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। কিন্তু সময় নেই, নেপালসিং এখনি ডাকবে। ঘরে ফিরে কমলসিংকে নেয়ে আসতে বললুম। মা একটু গুড়পাপড়ি করেছিলেন, সেই মা দিলেন। গুড়পাপড়ি আর কিছুই নয়, স্থকনো কড়ায় ঘিয়ে ভাজা আটা তাইতে গুড়ের গুঁড়ো বা চিনি মেশান। খেতে বসেই মনে হল নেপালসিং ডাকবে বলেছিল এখনও ও ডাকলে না, একবার দেখে আসি। মঠের কাছে গিয়ে দেখি নেপালসিং বাহিরে জব্বুর উপর নিজিষপত্র

তোলাচ্ছে, রওয়ানা হতে বেশী দেরি নেই। বললুম "তুমি বলেছিলে আমাদের ডেকে নেবে, না ডেকে রওয়ানা হচ্ছ?"

সে বলিল "তোমরা ত এলে না। এখন শীঘ্র এস।" আমি ছুটে গিয়ে, মাকে বললুম শিগ্‌গির এস, ওরা রওয়ানা হচ্ছে। কমলসিংকে জোরে জোরে ডাকলুম, সে তখন ফেরেনি। ছোট ছাটকা জিনিষ যা নিতে পারলুম নিয়ে মাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চললুম। আমাদের দেখে নেপালসিং নিজে যে জব্বুতে বসবে সেইটে মার জন্য ছেড়ে দিল। এ জব্বুটা বেশ শান্ত। মাকে তার ওপর বসিয়ে আমি ছুটে গেলুম কমলসিংকে ডাকতে সে তখন সরোবর থেকে আসছিল। তাকে বললুম শীঘ্র জিনিষপত্র নিয়ে আসতে। জব্বুদের ওপর মাল বোঝাই হয়ে গেছে, কমলসিং এল। নেপালসিং জব্বুওয়ালাদের বলে দিল আমাদের জিনিষগুলো চারিয়ে নিয়ে নিতে।

১৮

কাল বিকেলে মানস সরোবরের ধার দিয়ে যে ময়দানের ওপর দিয়ে এসেছিলুম তারই ওপর দিয়ে চলেছি। কাল কিন্তু এখানটা জনাকীর্ণ ছিল, আজ শূন্য। চলতে চলতে গুরলা-লার ঢালু চড়াইর উপর আসতে নেপালসিং জব্বুওয়ালাদের বিশ্রাম ও খাবার জন্য বসিতে বলিল। আমরাও বসলুম ও গুড়পাপড়ি

বার করলুম। ওরা চার জন্য একটা ডেকচিতে জল বসাইল। জল গরম হলে তাতে এরা চায়ের পাতা ফেলে দেয় ও তারপর একটু নুন। আর যদি থাকে ত চর্ব্বিও কিছু ঐতে ছেড়ে দেয়ে। এই চার জল ছাতুতে মিশিয়ে খায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আমরা আবার চলতে লাগলুম। মান্ধাতা থেকে বরফ গলা জলের স্রোত সামনে। নেপালসিং জব্বুর উপর বসে পার হয়ে গেল। জব্বুওয়ালারাও জব্বুর ওপর শুয়ে পড়ে পা তুলে নিয়ে পার হয়ে গেল। কমলসিং মার জব্বুকে ধরে নিয়ে চলল। জব্বুর উপর কম্বল রেখে saddle করা, মা তাইতে বসেছিলেন। স্রোতের মাঝামাঝি saddle ঘুরে যাওয়ায় মাও ঘুরে গেলেন, কিন্তু কমলসিং ধরে ফেলল, পড়লেন না। আমি এপারে দাঁড়িয়ে আছি, সকলে পার হয়ে গেল। স্রোতের টানে নাবতে ইতস্ততঃ করছি। জল হাঁটুর উপর, প্রায় কোমর অবধি। কমলসিংকে ডাকলুম এপারে আবার আসতে, তার হাত ধরে পার হব বলে, কিন্তু সে আসতে চায় না। এই ঠাণ্ডা জল ভেঙ্গে আবার আসতে কেহই চায় না। সে ঐ দিক থেকে বলতে লাগল চলে এস, চলে এস। আমি কিন্তু একলা যেতে পারছি না। এই দেখে নেপালসিং ধমকের স্বরে কমলসিংকে আমাকে ধরে নিয়ে আসতে বলিল। কমলসিং পার হয়ে এল। আমরা দুজনে ধরা ধরি করে জলে নাবলুম। কি ঠাণ্ডা জল, কি স্রোত। আর তলায় পাথরের নুড়ি, পা ভাল করে বসে না, পিছলে যায়। মাঝামাঝি গিয়ে আমি পা পিছলে পড়ছিলুম কমলসিংকে

আঁকড়ে ধরলুম। তাতে কমলসিংও ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু সামলে নিল। পড়ে গেলে ঐ স্রোতে আমরা বোধ হয় আর উঠে দাঁড়াতে পারতুম না। দুজনে জড়াজড়ি করে টাল সামলাতে সামলাতে আমরা পার হলুম। কাপড় বেশ খানিকটা ভিজে গেছে, পাও যেন অসাড়।

আবার চলা। জোর বাতাস। টিপ টিপ বৃষ্টিও হতে লাগল। মা জব্বুর ওপর বসে। গায়ে মাত্র একটা পাতলা বালাপোষ জড়িয়ে জব্বুর ওপর ঝুঁকে পড়ে ঠাণ্ডা বাতাসের তীক্ষ্ণতা আটকাবার চেষ্টা করলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। যেখানটা এসে পড়েছি সেখানটা সেঁতানে জমি, একটু একটু ঘাস আছে, দুচারটে ক্ষীণ সরু জলের ধারাও আছে। এইখানে জব্বুওয়ালারা আসিয়া, মালপত্র নাবাইতে লাগিল। এখানেই কি এরা রাত্রের আড্ডা করবে? এই খোলা ময়দানে কি করে রাত কাটান যাবে। নেপালসিংকে জিজ্ঞাসা করলুম। সে বলিল "হ্যাঁ, এখানে ঘাস আছে। জানোয়াররা রাত্রে চরতে পারবে।" আমি বললুম "কিন্তু এই ঠাণ্ডায়, এত উচ্চে খোলা মাঠে আমরা কি করে থাকব? আমরা এতে অভ্যস্থ নয়।" একটু উপরে চেয়ে দেখি একটা তাঁবু খাটান। নেপালসিং বললে "ওটা চীনাদের তাঁবু। তুমি যদি ওখানে থাকতে চাও ত গিয়ে দেখ।" অজানা ঐ চীনাদের সঙ্গে কোথায় গিয়ে থাকব, তাদের ছোট তাঁবুর মধ্যে জায়গাই বা কি করে হবে? এদিকে জব্বুওয়ালারা বোজকা-বুজকি নাবিয়ে

উত্তর দক্ষিণ মুখ করে একের ওপর এক রেখে ফুট তিনেক উঁচু একটা দেয়ালের মত করিল। তিব্বতে বাতাস প্রায় এক দিকেই আর তা পশ্চিম দিক থেকে বয়ে। এইজন্য এখানে স্থানে স্থানে যেখানে লোক রাত কাটায় উত্তর দক্ষিণ করে পাথর সাজিয়ে এইরকম দেয়াল করা থাকে। এখানেও ঐ রকম দেয়ালের মত করা হল। নেপালসিং বলিল "তোমাদের এর পাশেই শুতে দেব।" আড়ালের পূর্ব্বদিকে থাকলে বাতাস কম লাগে। নেপালসিং একটা কম্বলও দিল, যাকে বলে থুলমা।

আজ দশমি, কাল মার নির্জলা একাদশী। এখানে রান্না-খাওয়া কি করে হবে? নেপালসিং বলিল "কেন, আমরাও করব, তোমরাও কর। আমার লোকেরা যাচ্ছে রান্নার জন্য দামাঝাড় কেটে আনতে, তোমার লোককেও ওদের সঙ্গে পাঠাও।"

আগে বলেছি এখানে একরকম ছোট ছোট গাছ হয় যা কাঁচা কেটে ধরালেও বেশ জ্বলে। গাছের নাম দামা। এই গাছ কেটে জড় করেও লোকে এখানে রাখে। কমলসিং গেল, কাছাকাছি এই গাছ ছিল। কেটে নিয়ে এল। পাথর সাজিয়ে উনুন করে রান্না আরম্ভ হল। রান্না অর্থে আমাদের তিনজনের মত কখানা পুরি করা। ভাল আটা ভাল ঘিয়ের পুরি, ভাল খাদ্য, নুন গুড় দিয়েও ভাল লাগত। খাওয়ার পর আমাদের যা কম্বল বালাপোষ ছিল তাই পেতে নেপালসিংয়ের দেওয়া থুলমা মুড়ি দিয়ে মা ও আমি শুলুম। খোলা মাঠে, ষোল হাজার

ফুট উচ্চে, পূর্ব্বে তুষারাবৃত মান্ধাতা পর্ব্বত, তারই প্রায় পাদ-দেশে। উপরে মুক্ত আকাশ। এর চেয়ে ভাল শোবার জায়গা কি আর হতে পারে। দেয়ালে ঘেরা ঘরের ভিতর যেখান থেকে মুক্ত আকাশ দেখতে পাওয়া যায় না, যেখানে চারিদিকে আসবাব, পোষাক, কাপড় ইত্যাদি স্থান জুড়ে রাখে, একটু ঘোরা ফেরার স্বাধিনতা দেয় না, যেখানে একটু খোলা বায়ু, একটু মুক্ত আলোকের প্রবেশ আমাদের দরজা জানালা খোলা বন্ধ করার খেয়ালের উপর নির্ভর করে, যেখানে সদাই ডাকা ডাকি, ছুটা ছুটি, কোলাহল হট্টগোল, শব্দ, প্রতিধ্বনি, অশান্তি, উত্তেজনা, সেই ঘরে শোবার সময় সেইদিন প্রশান্ত মুক্ত আকাশের তলে শোবার কথা মনে হয়। সামান্য একটা কম্বল আর বালাপোষ পেতে শুয়েছি, একখানা কম্বল ঢাকা দিয়ে। মাথায় বালিস নেই, জামা কাপড় পাট করে তাই মাথায় দিয়েছি। কিন্তু তাতে ত কষ্ট হয়নি, কোন অভাব বোধ হয়নি। নেপালসিং যে কম্বল দিয়েছিল সেই একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে ত শীত বোধ হয়নি। মাঝে মাঝে নিশ্বাস নিতে মুড়ি খুলে মুখ বার করতে হয়েছিল। মুখ বার করে আকাশের দিকে চেয়ে যা দেখেছি তা কখন ভুলব না। কি স্বচ্ছ পরিস্কার আকাশ, যে আকাশ অন্যত্র ধুলা ধোঁয়ায় আবৃত থাকে। আর সেই অনন্ত বিশ্বজোড়া আকাশে অসংখ্য তারা যেন আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। কি উজ্জ্বল, যেন বিশ্বস্রস্টার বিশ্বরূপ, অসীম মহিমা, বিরাট রহস্য উদঘাটন করে আমাকে দেখাবার জন্য উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

ছোট ছোট কয়েক পাতার বইতে বিশ্বরূপের যে ব্যাখ্যা পড়েছি, নানারূপ মানব কল্পিত বিশেষন যুক্ত যে রূপ গুন বিশিষ্ঠ বিশ্ব-স্রষ্টার মুর্ত্তি মেনে নিয়েছি, সে ব্যাখ্যা, সে মুর্ত্তি, সে বর্ণন-বিবরণ, এই আকাশ জোড়া নক্ষত্র খচিত চিত্রপটে ফিকে হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল, রূপ অলঙ্কার বিশেষণ খসে পড়ল। মানুষের লেখা ধর্ম্মগ্রন্থ সব অর্থহীন হয়ে গেল। স্বর্গের কামনা সকলে করে কিন্তু তাহার সত্য সন্ধান কেহই করে না। ক্ষুদ্র বইর পাতার ভিতর, কোথায় কোন পাতায় দুটো শ্লোক, দুই ছত্র লেখা আছে, তাহার ভিতর স্বর্গের তথ্য অন্বেষন করে, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চেয়ে দেখে না। ক্ষুদ্র মানুষ ক্ষুদ্র এক মানুষকে গুরু সাজিয়ে গুরুর মণ্ডপে বসিয়ে তার কাছে ভগবান, ঈশ্বর, ব্রহ্মের কথা শুনতে চায়। তার কারণ ক্ষুদ্র কল্পনা, ক্ষুদ্র অনুভবের মানুষ ক্ষুদ্র কল্পনা, ক্ষুদ্র অনুভবের মানুষ-গুরুর নিকট যাহাদের জ্ঞানের চেয়ে দাম্ভিকতা ও গুরু হয়ে সম্মান ও প্রাধান্য পাবার আকাঙ্খাই বেশি তাদের কাছে বিরাট ব্রহ্মের মনমুগ্ধকর মিথ্যা স্বরূপের কথা শুনতে ভালবাসে। উহাই তাহার মনের মত হয়। মুক্ত আকাশে অসংখ্য তারা যখন আলো জ্বেলে তাঁর বিরাট রূপ দেখায় তা দেখেনা। নিশিথে যখন জগত সুপ্ত, বিশেষ করে মানুষ সুপ্ত, বাহিরে আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মাণ্ডের দূর দিগন্ত হতে যে আলো, যে বার্ত্তা, অসংখ্য তারা নিয়ে আসে তা আমরা দেখি না, ঘরে কপাট রুদ্ধ করে চোখ ঢেকে তখন নিদ্রার ঘোরে থাকি। গভীর রাত্রে আকাশের

নিচে বসে যে রকম গভীর চিন্তা, কল্পনা, ধ্যান, ধারনা, করা যায় অন্য কোন সময়েই তা হয় না।

সে রাত্রি কতবারই মুড়ি খুলে মহাকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। অৰ্দ্ধ চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। মান্ধাতার উচ্চ শিখর উৰ্দ্ধমুখ হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। চতুর্দিক শান্ত, নিস্তব্ধ। বাতাসের গতিও ধীর হয়ে এসেছে। খুব ঠাণ্ডা, আবার কম্বল টেনে মুড়ি দিলুম।

ভোর বেলা আমরা উঠে দূরে গিয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে তৈরি হয়ে নিলুম, ওরাও তৈরি হচ্ছিল। এখান থেকে মাইল চারেক গিয়ে একটা ছোট গ্রাম আছে যেখানে আমরা তাকলা-কোট থেকে আসবার সময় রাত্রে ছিলুম। আজ একাদশী, মাকে বললুম "মা আজ একাদশী, আজ আর বেশী হাঁটব না। চল ঐ গ্রামে আজ থেকে যাই।" মা বললেন "কেন, চল, এরা যেখানে যাচ্ছে চল।"

মা আমার মতই একহারা, তাঁর খাওয়া সামান্য, বিচার আচারের নিয়ম কঠোর, চোদ্দ দিন অন্তর দেড় দিনের নির্জ্জলা একাদশী, কিন্তু physical stamina, মানসীক শক্তি, ধৈর্য্য, কার্য্য ক্ষমতা অসাধারন। তাঁহার মানসীক শক্তি আমাকে কত দুর্গম পথে বল, সাহস, উৎসাহ দিয়েছে। আজ নির্জ্জলা উপবাস কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলিলেন "চল, ওরা যেখানে যায় চল।"

চলতে চলতে বিকেল হয়ে এল। এখন দূরে তাকলাকোটের

মঠ দেখতে পেলুম। এখান থেকে কিছু দূরে, সাত আট মাইল হবে, খোচরনাথ। আমাদের সেখানে যাবার উৎসাহ ছিল না। কৈলাশ দর্শন হয়েছে, আর কি দর্শন করব!

১৯

পরদিন সকালে লিপুর দিকে রওয়ানা হলুম। দুটো খচ্চর নিলুম, একটা মার জন্য ও একটা জিনিষের জন্য। নন্দরামকে কৃতজ্ঞতা জানালুম। তার সাহায্য না পেলে কৈলাশ দর্শন হত না। একটা জিনিষ চোখে পড়েছিল। নন্দরাম সব সময়েই বুট জুতো পরে থাকত, বুট জুতোটিও ছোট। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলিল যে শীতের আরম্ভে, অক্টোবর মাসে সে এবং অন্য ভোটিয়ারাও টাকলাকোট ও অন্যান্য মণ্ডি (mandi) থেকে ভারতে ফিরে যায়। গারবিয়াংয়েও শীতে বরফ পড়ে, খুব ঠাণ্ডা, দশ হাজার ফিট উঁচু। গারবিয়াংয়ের নিচে ধারচুলা পর্য্যন্ত তারা নেবে যায়। একবার কিন্তু সে ও তার দুই ভাই শীতে টাকলাকোটেই থেকে যাবে স্থির করে। অক্টোবর বেরিয়ে গেল, নভেম্বর এল। শীত দিন দিন যখন খুব বাড়তে লাগল তখন তারা ফিরে আসা ঠিক করল। খচ্চর, জব্বু ও লোকজন সঙ্গে নিয়ে ১৫ই নভেম্বর তাকলাকোট থেকে লিপুর দিকে রওয়ানা হল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, লিপু পৌছতে বিকেল হয়ে গেল। সেখানে তখন ঘোর দুর্যোগ, বরফ পড়ছে। এমন বরফ পড়ছে যে ওরা

লিপুতেই আটকে গেল, লিপু পার হতে পারল না। লিপুর দুপাশে এত বরফ জমে গেল যে কোন দিকে যাবার উপায় রহিল না। ওদিকে নন্দরামের এক ভাই গারবিয়াংয়ে। সে এদের টাকলাকোট থেকে ১৫ই নভেম্বর রওয়ানা হবার কথা জানত, কিন্তু তিন দিন হয়ে গেল এল না, বরফ পড়ছে, কোন বিপদে পড়েছে কি না চিন্তা করে তাদের সন্ধানে গারবিয়াং থেকে কজন লোক পাঠাল। বরফ কেটে অতি কষ্টে এই লোকেরা লিপুতে এসে নন্দরামদের অর্দ্ধ জীবিত অবস্থায় দেখিতে পায়। নন্দরামদের সঙ্গে যে খচ্চর জব্বূ এসেছিল তার মধ্যে দু চারটি ব্যতিরেকে সবই মৃত। এই লোকেরা বরফ বেষ্টিত নন্দরামদের কোন প্রকারে উদ্ধার করে গারবিয়াং নিয়ে এল। জিনিষ পত্র যা ছিল সব ওখানে ছেড়ে দিল। নগদ টাকাও কয়েক হাজার বরফে চাপা রহিল। ছয় মাস পর বরফ গলিলে ঐ জিনিষ পত্র উদ্ধারের জন্য গারবিয়াং থেকে লোক যায়। চারদিন লিপুতে বরফ বেষ্টিত থাকার সময় নন্দরামের দুই পায়ের সব আঙ্গুল frost bite য়ে খসে যায়। সেইজন্য সে বুট পরে থাকে।

২০

এবার লিপু আমরা বেলা বেলি পার হয়ে গেলুম। খচ্চর সঙ্গেই ছিল। সন্ধ্যার সময় কালাপানি এসে গেলুম। কালী গঙ্গার ওপারে নেপাল রাজ্য। কালাপানিতেই

আজ রাত্রিবাস। তাকলাকোট থেকে এক টানায় চলে এসেছি। এখান থেকে গারবিয়াং মাইল বার।

পরদিন গারবিয়াং পৌঁছে খচ্চর ছেড়ে দিলুম। কৈলাশ দর্শন হয়েছে, মনে শান্তি, সন্তোষ। দলীপসিং আমাদের দেখে খুসী। আজ আমাদের খাবার জন্য আটা ঘি সব পাঠিয়ে দিল, তার মূল্য নিল না। পরদিন সকালে গারবিয়াং থেকে আমরা নেবে চললুম। বুধি পার হয়ে রাত্রে আবার মালপায় আসতে হল, যেখানে যাবার সময় পিশুর কামড়ে ছট্‌ফট্‌ করেছি। ক'দিন আগে এই পথ দিয়ে গেছি, তখন যে রকম স্থানে স্থানে দুর্গম বোধ হয়েছিল এখন ততটা বোধ হল না। মালপা থেকে এসে আবার সিরকায় ও তার পরদিন পঙ্গূতে রইলুম। পঙ্গূতে দোকানদারের স্ত্রী আমাদের সঙ্গে যে একটা এলুমিনিয়ামের বোয়েম ছিল সেটা চায়, কিন্তু আমাদেরই দরকার বলে তখন সেটা দিতে পারা যায় নি। দ্বিতীয়বার যখন যাই তাকে দেবার জন্য ঐ বোয়েমটা নিয়ে যাই ও দিয়ে আসি। ধারচুলার দশ মাইল দূরে খেলা। খেলার ঘি প্রসিদ্ধ, ওরকম গাওয়া ঘি কোথাও দেখিনি। দামেও খুব সস্তা। টাকায় পাঁচ পো। আজকাল কল্পনাও করা যায় না। কিছু ঘি কিনে আনি।

ধারচুলা পৌঁছিতে রায় সাহেব প্রেম বল্লব সাদরে ঘরে নিয়ে গিয়ে পথের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের অগ্রসর হবার পর কৈলাশ অঞ্চলে ডাকাত আসার সংবাদ পেয়ে তিনি আমাদের জন্য চিন্তিত ছিলেন। সব শুনে বললেন "তোমাদের

ভালভাবে দর্শন হয়েছে তাতে আমি বড় খুসী। আমার মনে দুশ্চিন্তা ছিল, এখন এখানে দুদিন বিশ্রাম করে যাও।"

তাঁর স্ত্রীরও কি যত্ন। মার আপত্তি সত্ত্বেও মার পা টিপে দিলেন। কৈলাশ যাত্রীদের এখানে সকলেই যত্ন করে। পথে চলতে চলতে এক জায়গায় রান্নার জন্য আমি পথ ছেড়ে নেবে কাঠ আনতে যাই, মাকে বলে "তুমি আস্তে আস্তে চল, আমি কাঠ নিয়ে আসছি"। নিচে একজনের ঘর, বাহিরে সংগৃহিত কাঠ। আমি কাঠ কিনতে যাইলে সে বলিল "তুমি এমনি নিয়ে নাও, বেচব না।" আমি বললুম " তা হয় না"। আমাদের কথা শুনে তাহার বৃদ্ধা মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ও শুনলেন আমার মা ও আমি কৈলাশ থেকে ফিরছি। তোমার মা কোথায় জিজ্ঞেস করায় আমি বললুম মা এগিয়ে যাচ্ছেন আমি কাঠ নিতে এসেছি। শুনে তিনি ছুটে ঘরে গিয়ে একটা কলা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ঘরে একটা মাত্রই কলা ছিল। কলা হাতে নিয়ে উপরে পথে উঠে মাকে কলাটি দিতে গেলেন। তাঁর ছেলেও আমার কথা না শুনে কিছু কাঠ কমলসিং কে ধরিয়ে দিল। এদের সরল আন্তরীকতা হৃদয় স্পর্শ করে।

সকালে ধারচুলা থেকে রওয়ানা হবার সময় রায় সাহেব প্রেম বল্লভ মাকে হাত জোড় করে প্রণাম করে আমাকে বুকের উপর নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। চোখে তাঁহার জল। আমিও আবেগ ভরে তাঁহাকে ধরলুম। তাঁহার সেই আন্তরীক আলিঙ্গন,

তাঁহার চোখের জল আমাকে অভিভুত করেছিল। এখনও তাঁহার স্পর্শ, তাঁহার অশ্রুভরা স্নেহদৃষ্টি আমার গায়ে লেগে আছে, মনে অঙ্কিত আছে, চোখের সামনে সেদিনকার মতই সুস্পষ্ট হয়ে আছে। তখনও ভেবেছি, এখনও ভাবি তাঁহার এ স্নেহ, এ আন্তরীকতা এত অল্প পরিচয়ে কি করে আমাদের উপর এল। আমি সুদূরবাসী, অপরিচিত। যাত্রার পথে কদিনের পরিচয়। একি কোন পূর্ব্ব জন্মের সম্বন্ধের টান। জানি না, কিন্তু কি করে হয় ভাবি, ভেবে পাই না। এরকম অভিজ্ঞতা কখন কখন আরও হয়েছে। মদ্ মহেশ্বরের পথে লেঙ্কে (Leink) একটি যুবক, নাম ওম্প্রকাশ শুক্ল, তার সঙ্গে এক দিনের পরিচয় এক রাত্রি এক স্থানে থাকাতেই এমন হয়ে গিয়েছিল যে আমাদের সেখান থেকে চলে আসার সময় তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে, আমি ও আমার স্ত্রীও অভিভুত হয়ে পড়ি। হঠাৎ কাহারও কাহারও সঙ্গে এরূপ স্নেহ মোহ কেন কি করে হয়, ইহা নিগুঢ় রহস্য। আবার যাদের সঙ্গে জন্মগত একটা সম্বন্ধ হয়েছে তাদের সঙ্গে কিরূপই না অশান্তির সম্বন্ধ হয়ে দাঁড়ায়। রায় সাহেব প্রেম বল্লভ ও ওম্ প্রকাশের মত যাঁরা অযাচিত, অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে স্নেহ আন্তরীকতা ঢেলে দিয়েছেন। তাঁদের দেখতে, তাঁদের নিকট যেতে তীর্থ দর্শনে যাওয়ার চেয়েও বেশি আমি ইচ্ছা ও চেষ্টা করি। ১৯৫৪ সালে যখন আবার কৈলাশ যাই রায় সাহেব প্রেম বল্লভের সহিত আবার দেখা হবার জন্য ব্যগ্র ছিলুম। কিন্তু ধারচুলা গিয়ে শুনলুম

তিনি তখন নেই। মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তার স্নেহ মোহ নিয়ে একি দারুণ খেলা। খণেকের মিলন, খণেকে বিচ্ছেদ। মানুষ এই মিলন বিচ্ছেদের উপহাসে নিস্পিড়িত, জর্জ্জরিত। তার কি অপরাধে যে তার উপর তাঁর এই নিদারুণ খেলা, এই নিষ্ঠুর তাণ্ডব লীলা, জানি না। এর কারণ গুঢ় রহস্যপূর্ণ, অবোধ্য, একথা যে বলে আমি মেনে নি, কিন্তু যখন কেহ দাঁড়িয়ে নানান বিশেষণ দিয়ে ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করেন তখন আমি এই বলতে চাই যে আপনার ঐ বিশেষণের মধ্যে যেকটা রাখবার রাখুন আমার বলবার নেই। ওসব সম্বন্ধে জানবার আমার ঔৎসুক্যও নেই। জীবনে ওসব কথা অবান্তর মনে হয় বলে ওবিষয় কোন প্রশ্ন তুলতেও ইচ্ছা হয় না। তবে দয়াময় বিশেষণটা বাদ দিন। ভগবান আর যাই হোন্ দয়াময় নন,— নির্দয়, কঠিন, নিষ্ঠুর। এর প্রমাণ আমি চারিদিকেই দেখি।

২১

আলমোড়াতে বাসে উঠে ভওয়ালিতে নাবলুম। বড়মামা আমরা কবে ফিরব জানতেন না। পিশুর কামড়ে আমার গায়ে ও পায়ে দাগড়া দাগড়া হয়ে গিয়েছিল। পায়ে জুতো পরতে পারতুম না। পায়ের ক্ষত সারতে বেশ কিছু দিন লেগেছিল।

সামনে সূর্য্যগ্রহণ, আমরা মনে করলুম সূর্য্যগ্রহণে কাশীতে

স্নান করে যাই। তার আগে নৈমিসারণ্য যাবারও ইচ্ছে হল। বালামৌ স্টেশনে নেবে ব্রাঞ্চ লাইনে পাঁচ ছয়টা স্টেসন যেতে হয়। ছোট্ট জায়গা, গ্রাম বললেও বলা যায়। একটি ছোট জলের কুণ্ড, পাশে ছোট মন্দির। একদিন এই স্থানের বিশেষত্ব ছিল। এখানে ঋষিদের সভা বসিত যেখানে ধর্ম্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হইত, পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও ধারণার বিনিময় হইত। যখন এইরূপ আলোচনা, পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদান হইত তখনই সনাতন ধর্ম্মের উৎকর্ষ হইয়াছিল। তখনই সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম জীবিত ছিল। যেদিন হইতে এইরূপ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক, বন্ধ হইল এবং অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ ভক্তির প্রচার চলিল সেইদিন হইতে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের শেষ হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে অজ্ঞানের অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িল। এবং অন্ধ বিশ্বাস লোকের মন আচ্ছন্ন করিল। আর সেই সঙ্গে ধর্ম্মের নামে অন্ধবিশ্বাস লোকের মন আচ্ছন্ন করিল। আর সেই সঙ্গে ধর্ম্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসের exploitationও আরম্ভ হইল।

সব ধর্ম্মেই সরল লোকের দুর্ব্বলতা ও তাহাদের মনে সহজে ঢেলে দেওয়া অন্ধবিশ্বাস ধর্ম্ম-যাজকেরা কিছু না কিছু exploit করিয়াছেন, তবে হিন্দুধর্ম্মে এরূপ explotation বড়ই দুঃখের কারণ হিন্দুধর্ম্মে জোর দিয়াই বলা হইয়াছে যে লোভ, মোহ, অজ্ঞানই ভয়ের ও দুঃখের কারণ এবং সেইজন্য ঐসব হইতে মুক্ত না হইলে দুঃখ, অশান্তি যাইবে না। আরও বলা

হইয়াছে যে ঐসব হইতে মুক্তির উপায় অন্ধ ভক্তি বিশ্বাস নয়, উপায় জ্ঞান। জ্ঞানের অগ্নিতেই ঐসব দূরিভুত ও ভষ্মিভূত হইতে পারে। বিচার ও জ্ঞানের সামনে ভয়ের ও দুঃখের কারণ অর্থহীন হইয়া যায়। বালক-বালিকারা খেলাঘরে খেলার জিনিষ লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি, কান্না-কাটি যখন করে আমরা দেখিয়া হাসি। সেইরকম জ্ঞানীরাও হাসেন আমাদের জীবনের নিত্য ঘটনায় উত্তেজিত হইতে এবং লোভ ও মোহ জনিত দুঃখ, ভয় ও অশান্তিতে অভিভূত হইতে দেখিয়া। তাঁহারা বোঝেন দুঃখ অশান্তি জয়ের উপায় কেবল জ্ঞান যে জ্ঞান লোককে বুঝাইয়া দেয় যে ঐসব দুঃখজনক ঘটনাকে এবং লোভ ও মোহের বস্তুকে তাহারা যে অর্থ ও বিশেষত্ব দেয় তাহা মিথ্যা, অবাস্তব ও অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না। সে চায় লোভ-মোহের বস্তুকে জড়াইয়া রাখিয়া সুখ শান্তি ভোগ করিতে। লোভ, মোহ, কামনার কিন্তু তৃপ্তি নেই, তাদের শেষ নেই। সেইজন্য গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে এবং জ্ঞানযোগকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে। গীতায় তাহা বলা হইলে কি হইবে সাধারণতঃ দেখা যায় যাঁহারা নিত্য গীতা পাঠ করেন তাঁহারাও ঐসব সার উপদেশের দিকে লক্ষ্য রাখেন না। মনে হয় যেন পড়েন এই আশায় যে গীতা পাঠে পুণ্য হইবে এবং তাহলেই আশা কামনা বেশি করিয়া পূর্ণ হইবে।

লোভ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে জ্ঞানের মার্গে না গিয়া অজ্ঞানের পথেই চলে এবং সাধু গুরুর সন্ধান করে যাঁহারা

তাহাদের আশা বাসনা তাঁহাদের অলৌকিক কোন ক্ষমতা বলে পূর্ণ করিয়া দিবেন। চারিদিকেই তাই দেখি সাধু আর গুরুর অন্বেষন।

হিমালয়ে ঘুরিয়া আসিলে রাস্তার মোড়ে যাঁহারই সহিত দেখা হয় তিনিই জিজ্ঞাসা করেন "কোন সাধু মহাত্মার দর্শন পেলেন?" যদি বলি "না" ত তাঁরা মনে করেন নয় হিমালয়ে যাইনি, না হয় হিমালয়ে আসল জায়গায় যাইনি, কিম্বা হিমালয়ে যাওয়া বৃথা হইয়াছে। এঁদের সকলের ধারণা স্থানে স্থানে সেখানে সাধু, যোগী, বসিয়া আছেন যাঁহারা আগন্তুককে নিজেদের যোগবল, বিভূতি, অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইয়া ধন্য করেন। ইঁহারা কখন ভাবিয়া দেখেন না যে যিনি সত্যই সাধু বা সাধক তিনি পথের ধারে কুটির বাঁধিয়া সাইনবোর্ড ঝুলাইবেন না লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে। বেশেরও তিনি রকমারি করিবেন না। তিনি জ্ঞানী, তিনি জানেন বেশ বদলাইলে, পোষাক রংয়াইলে বা লেঙ্গুটি-কৌপিন পরিলে সাধু হওয়া যায় না। মনোভাব সাধু হওয়া চাই যে মনোভাব জ্ঞান, বিচার, নিষ্ঠা, নির্লোভ, বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া আসে। যিনি সত্যকার সাধু তিনি সাধু সাজিবেন না, গুরু হইয়া বসিবেন না, বিভূতির নামে যাদু দেখাইবেন না। যাঁহারা সাধু সাজিয়া পথে ঘাটে, পাহাড়ে পর্ব্বতে বসিয়া থাকেন তাঁদের মধ্যে নয় বরং গৃহস্থের ভিতরই সাধু ভাবাপন্ন ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহাদের নিকট জ্ঞানের কথা শোনা যায়, ভাবিবার বিষয় পাওয়া যায়।

ইঁহারা সাধুর ভড়ং করেন না, সাধু বলিয়া নিজেকে প্রচার করেন না, আর স্বর্গের পথ জানেন তা বলেন না। ইঁহারা জ্ঞানের কথাই বলেন, তবে নিছক জ্ঞানের কথা কেইই বা শুনিতে চায়। লোকে জ্ঞান চায় না, যে জ্ঞানের দ্বারাই দুঃখ-শোক অতিক্রম করিয়া প্রকৃত সুখশান্তি পাওয়া যায়, লোকে চায় লোভ, বাসনা, কামনা সিদ্ধি যাহা বেশধারি সাধুরা দিতে পারেন সে মনে করে। যদি এই সাধুদের মধ্যে কেহ একটা ভেল্কি দেখাইয়া দর্শকদের চমৎকৃত করিতে পারেন ত কথাই নাই, তিনি মহাপুরুষ, এমনকি অবতার হইয়া যান।

এই রকম অনেক সাধু দেখিয়া সাধু দর্শনের ঔৎসুক্য চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম যখন হিমালয়ে যাই তখন পথে লোকেদের জিজ্ঞাসা করেছি "এখানে কোথাও সাধু আছেন?" একবার গঙ্গোত্রীর পথে দুইজন সাধুর কথা শুনি। একজন দক্ষিণ ভারতীয়। তিনি কিন্তু পথ হইতে আর এক দিকে কিছু দূরে ছিলেন সেইজন্য তাঁহার নিকট যাওয়া হয়নি। অপরজন বাঙালী, ফলাহারী বাবা বলিয়া ঐ অঞ্চলে জানিত। তিনি ধরালির নিকট থাকেন। পথ হইতে নাবিয়া গঙ্গার ধারে একটা প্রাচীন ভগ্ন ঘরের ভিতর। মা ও আমি গিয়া বসিলাম। একটা ধুনি ঝিমিয়ে জ্বলছে, তার পাশে একটা পাথরের উপর তিনি উপবিস্ট। লেঙ্গুটি ভিন্ন গায়ে কোন বস্ত্র নেই। কেন, কিভাবে এখানে এসেছেন তার কিছু বৃত্তান্ত শুনলুম, তবে সেকথা এখন যাক্। ইঁহার উল্লেখ করছি এইজন্য যে এই একজন সাধু দেখি

যিনি বড় বড় কথা বলেন না, আর বিভূতি, যাদুও দেখান না। বলেন "তুমিও যা, আমিও তা।" মা প্রশ্ন করেন "আপনি যে এইভাবে আছেন, কি পেয়েছেন?" উত্তরে তিনি বলেন "পাব কি? হট্‌যোগ করি, আর নিজের সঙ্গ করি।" ইনি এখনও বর্ত্তমান, থাকেন এখন উত্তরকাশীতে, কালিকমলির ধর্ম্মশালার পাশে গঙ্গার ধারে। অর্দ্ধশতাব্দির বেশি হিমালয়ে আছেন। ওঁকে এখানে সকলেই খুব শ্রদ্ধা করে। সাধুরাও আসিয়া প্রণাম করে। উনি কিন্তু কখন মন ভোলান কথা বলেন না। বরং বলেন "গঙ্গোত্রী যাচ্ছ, বেশ; তবে সাধু মহাত্মার পেছনে যেওনা। এখানে হিমালয়ে এসে বসলেই সাধু মহাত্মা হওয়া যায় না। তোমরাও যা আমরাও তাই। তোমাদের মত আমাদেরও ভেতরের মলমূত্রাদি দুর্গন্ধময়, সুগন্ধময় হয়ে যায়নি। তোমরা সাধুর খোঁজে হয়রান হও কেন জানি না। সাধু গুরু ত তোমার অন্তরেই অধিষ্ঠিত। সেই অন্তরে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের সঙ্গ কর, আর কারও সঙ্গ খুঁজ না।"

ওঁর কথা মনে লাগে। যখনি ওদিকে যাই উঁহার কাছে বসি। একবার আমার স্ত্রী ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন "আচ্ছা আপনার গায়ে কিছু নেই, শীত করে না?"

"তোমরা গা খোলা, লেঙ্গুটি পরা লোক দেখলেই তাকে সাধু মনে করে নাও, কিন্তু তা নয়। আমরা বরাবর গা খুলে রেখে আসছি সেইজন্য আর শীত করে না। যেমন তোমরা মুখ হাত খুলে রাখ বলে মুখে হাতে ঠাণ্ডা লাগে না।"

এই রকম স্পষ্ট কথা অন্য সাধুর কাছে শোনা যায় না। তবে সত্য স্পস্ট কথা কেহ শুনিতে চায় না। যেমন বলেছি লোকে শুনিতে চায় কি করিয়া, কি উপায়ে তাদের লোভ, কামনা, বাসনা পূর্ণ হইবে। সেইজন্যই তাহারা যাদুকর সাধুর সন্ধানে যায় যাহারা কামনা সিদ্ধির উপায় বলিয়া দিবার লোভ দেখায়। সত্যকার সাধু কামনা সিদ্ধির উপায় দেখাইবেন না, লোভ, বাসনা, কামনা জয় করিতে বলিবেন।

উত্তরকাশীর ঐ ফলাহারী বাবার কথা কিন্তু গভীর ভাবে ভাবিবার যোগ্য। বাসনার সংযম ও জয়তেই শান্তি ও সন্তোষ আসা সম্ভব। আর ইহাও ঠিক যে হিমালয়ে গিয়া বসিলেই যদি সাধু হওয়া যাইত ত সাধুর ছড়াছড়ি হইত। সকলেই ওখানে গিয়া সাধু হইতে পারিত। কিন্তু জনকরাজা সিংহাসনে বসিয়াও যতটা সাধু হইয়াছিলেন মুনি-ঋষিরা বনেজঙ্গলে বসিয়াও তত হন নাই। সেই রকম জ্ঞান-বিহিন যাগযজ্ঞ তপস্যা পূজা করিয়াও যে তেমন কিছু হয়না তাহা কোন কোন মুনি-ঋষিদের কাহিনীতেই দেখা যায়। তাঁহাদের চারিত্রিক অসংযম দেখিয়া সন্দেহ হয় জপ-তপে কিছু হয় কি না। একটু কিছু কেহ করিলেই তাঁহারা ক্রোধে আত্মহারা হইতেন, এবং ক্রোধের পাত্রকে ক্ষমা করা ত দূরের কথা একঠু আধটু ধমক ধামক দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। একেবারে ভষ্মিভুত করিতেন। অন্যান্য ব্যাপারেও তাঁহাদের অসংযম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহারা অন্যদের যাহা উপদেশ দিতেন, যেমনকি রিপুজয়ের

বিষয়, নিজের জীবনে তাহা পালন করিতে পারিতেন না। বশিষ্ঠ রামের বনবাসে যাইয়ার সময় শোকার্ত্ত দশরথকে অনেক দার্শনিক কথা শুনাইয়া তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু নিজের উপর ঐরূপ অবস্থা আসায় শোকাভিভূত হইয়া আশ্রয় ছাড়িয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। গৃহস্থের মধ্যে কিন্তু ঐরূপ মুনিঋষিদের অপেক্ষা সংযত, উদার, ক্ষমাশীল ও শোক-দুঃখে অবিচলিত ব্যক্তি দেখা যায়। তবে অবশ্য সব মুনিঋষিরা ঐরূপ ছিলেন না। যাহা হউক ইহাতে ইহাই বোঝা যায় যে হিমালয়ে বা অন্যত্র পথের ধারে সাধু সাজিয়া বসিয়া 'অলৌকিক কিছু দেখাইলে সাধু হওয়া যায় না, বরং যাঁহারা এইরূপ করেন ও দেখান তাঁহারা যে মোটেই সাধু নন তাহাই জানা যায়।

তাছাড়া কোন অলৌকিক ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে তাহাতে কিছু অলৌকিকত্ব নাই। সরল লোক যাহারা ভিতরের ব্যাপারে বুঝিতে পারে না তাহারা যাহা বুঝিতে পারে না তাহাকে অলৌকিক মনে করে, আর ঐ অলৌকিক ব্যাপার যাহারা দেখায় তাহাদের যোগী ও মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করে।

সাধু গুরু সম্বন্ধে এমনি অন্ধ বিশ্বাস লোকের মনে চেপে বসেছে যে তাঁদের বিষয় কিছু বিচার করিবারও যে থাকিতে পারে তাহা কেহ মনে করে না। উঁহারা সব পারেন, কেবল তাঁহাদের কৃপা হইলেই হইল। কি প্রকারে তাঁহাদের কৃপা লাভ হয় এইসব ব্যক্তিদের কেবল সেই চিন্তা। অথচ ভাবিয়া

দেখিলেই বোঝা যায় যে যদি ঐ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহাত্মাদের কিছু জ্ঞান থাকিত এবং ভগবানের উপর একটুও সত্যকার বিশ্বাস থাকিত তো তাঁহারা গুরু হইয়া কানে মন্ত্র না ঢালিয়া দীক্ষা-প্রার্থীদের বলিতেন "তোমরাও যা আমিও তাই। তোমাদেরও যিনি করেছেন, আমাকেও তিনি করেছেন। আর তিনি উভয়কেই নিয়ে চলেছেন কোথায়, কেন, কিভাবে তাহা আমিও জানিনা তোমরাও জান না। কেবল জানি যে তাঁহার শক্তির উপর আমার তোমার শক্তি চলিবে না। তাঁহার শক্তিতেই আমরা উভয় চালিত। তিনিই আমাদের উভয়ের গুরু ও পথ নির্দেশক।"

কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস টলে না, লোকে তাইকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে, সত্যের দিকে যায় না। গুরুরা লোকের অন্ধ বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করিয়া দেন যাহাতে তাদের ঐ অন্ধ বিশ্বাসের উপর তাঁহাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠ থাকে।

১৯৫৪

১

৮ই মে, দিল্লী মেলে কলকাতা থেকে রওয়ানা হয়েছি কৈলাশ মানস সরোবর দর্শনে। তের বছর পর। ট্রেন চলেছে, অন্ধকারে জানলার বাহিরে চেয়ে আছি। কিন্তু দেখছি অভ্র-ভেদি সেই কৈলাশ শিখর, তার পদতলে সেই নীল প্রশান্ত মানস সরোবর ও রাক্ষসতাল, যাহা দেখেছিলুম সেই যেদিন গুরলা-লার উপর এসে প্রথম দাঁড়াই। সুস্পষ্ট সেই দৃশ্য। একে একে সেই পথ, লিপুর উপর দিয়ে পার হওয়া, ভোটিয়াদের ঘরে বালির উপর শোয়া, তাকলাকোটে নন্দরামের ঘর, তারপর ঠোকরের ব্যাপার, পরে মান্ধাতার নীচে মুক্ত আকাশের তলায় শুয়ে ঝক্ ঝকে নক্ষত্র-ভরা আকাশের পানে চাওয়া—সেই সব কথা, সেই সব দৃশ্য সুস্পষ্ট মনে আসছে, চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে।

এবার সঙ্গে মা নেই। শৈশব থেকে যাঁকে ছাড়া কখন হইনি আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতি সুস্পষ্ট আছে। কত তীর্থে, কতস্থানে গেছি, মা সঙ্গে ছিলেন। ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়েছিঁ কিন্তু মার কাছে সেই ছোটই ছিলুম। মাকে সেই একই ভাবে দেখেছি, একই ভাবে জেনোছ। একই ভাবে তাঁর কোলেই শুয়েছি। আমার দুবছর বয়েসেই পিতা

চলিয়া যান। তাঁর ছবিতেই তাঁকে দেখেছি, আর তাঁর কথা যা শুনেছি তাই থেকেই তাঁকে ভেবেছি। তাঁহার অবর্ত্তমানে মনের ভিতর একটা অভাবের ফাঁক অনুভব করেছি, এখনও করি। তবে আমার কাকা, হেমচন্দ্র গাঙ্গুলী, কোন ভাবেই পিতার অভাব আমাকে বুঝিতে দেন নি। আমার কাকাকে সাধারণ মানুষ বল্‌লে তাঁহার বিষয়ে কিছুই বলা হয় না। দেবতা বলিলেও ঠিক বলা হয় না, কারণ দেবতাদের গুণাগুণের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে কাকাবাবুর যে গুণ মহত্ত্ব ছিল তাহা দেবতাদের গুণের মধ্যে পাওয়া যায় না, তাঁদের গুণের চেয়ে অনেক উচ্চ, অনেক বেশি মহৎ। তাঁহার আয় অল্প, সংসার বৃহৎ, পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা, বৃদ্ধ পিতা মাতা, বিধবা দুই ভগ্নি, তা সত্ত্বেও তিনি মাতুলালয় থেকে মাকে আমাকে নিয়ে আসেন যেই গিয়া দেখেন যে সেখানে আমার দেখাশোনা, পড়া শোনার সুবন্দোবস্ত নেই। কেবল আমাকে নিয়ে আসেন নি। আমার জন্য যে কি করেছেন তা শত পৃষ্ঠা লিখিলেও কিছুই লেখা হবে না। লিখিলেও লোকে বিশ্বাস করিবে না যে তিনি নিজের ছেলেদের চেয়ে সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে আমাকে বেশি করেছেন। তাঁর প্রতিটি কথা আমার বুকের ভিতর গভীর ভাবে লেখা আছে, কখন তা মুছিবে না, মুছিতে পারিবে না। পূজোর কাপড় কিনতে নিয়ে গিয়ে কোন্ কাপড় চাই আমাকে বলতে বলতেন। তাঁর ছেলে যদি কিছু চাইত ত বলতেন "না, হাবু যেটা পছন্দ করবে সেটাই কেনা হবে।"

আমি চুপ করে থাকতুম, কিছু বলতুম না, তাতে তিনি দুঃখিত হতেন। আমি ও তাঁর এক ছেলে দুজনে এক স্কুলে পড়ি। আমি একবার একটা মেডেল পাই, তাইতে যে কাকাবাবুর কি আনন্দ উল্লাস তা আমার এখনও চোখের সামনে রয়েছে। নিজের ছেলে মেডেল পেল না ভ্রাতস্পুত্র পেল, এতে সকলের মনই ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু কাকাবাবুর হয়নি। স্কুল থেকে আমাকে বাড়ী এনে কি উচ্ছসিত আনন্দে বললেন "আজ হাবু মেডেল পেয়েছে আজ রুটি নয় আজ সকলে পুরি খাবে।" তাঁর সেই উচ্ছসিত আনন্দের স্বর সেই সেদিনের মত আমার কানে এখনও লেগে আছে। স্কুলের বাৎসরীক পরীক্ষা থেকে নিয়ে ইউনিভারসিটির শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত তিনি আমার কলমটিও ঠিক করে দিতেন। যে এক্কা করে একজামিন দিতে যাব তা এল কি না বার বার খবর নেবেন। পাছে আমার দেরি হয়ে যায় সেজন্য বার বার ঘড়ি দেখে আমাকে বলতেন। আমার নাওয়া খাওয়া ঠিক হল কি না ঘুরে ঘুরে দেখতেন। যতক্ষণ না আমি এক্কায় উঠে বসব ততক্ষণ তাঁর কোন চিন্তা, কোন কাজ থাকত না। রাত্রে উঠে এসে বাহিরে থেকে আমার মাথার শিয়রের খোলা জানালা ভেজিয়ে দিয়ে যেতেন আমার যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। পাড়ায় প্লেগের কেস্ হওয়ায় আমাকে মার সঙ্গে শহরের বাহিরে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। আর নিজের ছেলেমেয়ে ও আর সকলকে নিয়ে বাড়ীতেই

থাকেন কারণ সকলকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর একবার change এর জন্য কত খরচ করে আমাকে মার সঙ্গে Nainital পাঠিয়ে দেন, নিজের ছেলে মেয়েদের ও আর সকলকে নিয়ে এলাহাবাদে বাড়ীতেই থাকেন। সকলকে নিয়ে যাবার মত খরচ ছিল না। আয় কম কিন্তু আমার জন্য কখন খরচের কথা ভাবেন নি। কাকীমার মনেও কখন লেশ মাত্র ক্ষোভ হইত না তাঁর ছেলেমেয়েরা changeয়ে গেল না বলে বা আশে পাশে প্লেগ হচ্ছে, আমাকে সরিয়ে দেওয়া হল তাঁর ছেলেমেয়েদের সরান হল না বলে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণে কোথাও কোন দেশের কোন ইতিহাসে বা সাহিত্যে কাকাবাবু ও কাকীমার দৃষ্টান্ত নেই। এরকম চরিত্রের কল্পনাও কেহ করিতে পারে নি। একবার আমার খুব অসুখ করে, বুকে নিমোনিয়া। নিমোনিয়া epidemic সেবার দেশে মহামারিরূপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাক্তারেরা আমার জন্য চিন্তিত। কাকাবাবু রাত্রে প্রার্থনা করেন 'ভগবান আমার পাঁচ ছেলেকে নাও হাবুকে বাঁচিয়ে দাও।' পরদিন সকালে আমার জ্বর কমে যায়। জগতে কোন যুগে, কেহ কোথাও এ রকম প্রার্থনা কি করেছে? আমরা যাঁদের অবতার বলি, যাঁদের পূজা করি, তাঁদের মধ্যেও কাকাবাবুর এই মহান চরিত্রের কোন নিদর্শন দেখতে পাই না। কাকাবাবুর কথা কত লিখিব। লিখে শেষ করা যায় না। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিও তাঁহার যত্নের কথা অবিশ্বাস্য। আমার পিতামহ

লোককে দিতে, খাওয়াতে ভালবাসতেন, তাইতেই যত্র আয় তত্র ব্যয় করিতেন। বন্ধু বান্ধবেরা কেহ কেহ ঋণ স্বরূপ সাহয্য নিয়ে পরে শোধ করিত না। কেহ কেহ বা hand-note দিয়ে অন্যত্র টাকা নিবার সময়ে উঁহাকে জামিন হইতে বলিত। পরে এরকম কোন কোন জামিনের ঋণ তাঁহারই উপর আসিয়া পড়ে। যখন কাকাবাবুর উপর সংসার আসিয়া পড়ে তখন তাঁহার বয়স ৩০ য়ের কম, মাহীনা সামান্য। সংসারের সহিত পিতার ঋণও তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। পিতা যে hand-note এ জামিন ছিলেন আইনত তাহার মেয়াদ তখন উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁবাদি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পিতৃঋণ কখন তাঁবাদি হয় না বলিয়া পিতার সব ঋণই তিনি নিজের উপর নেন এবং তাহা সুদ সমেত পাই পাই শোধ করেন। অফিসে মাহিনা পেলে আগে গিয়া ঋণের সুদ ও যথা সম্ভব ঋণ শোধের টাকা দিয়া যা থাকিত তাহা বাড়ী আনিতেন ও তাহাতেই সংসার চালাবার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু সংসারে এইরূপ টানাটানি অবস্থা সত্ত্বেও পিতার যেন কোন কষ্ট না হয় সে বিষয় তিনি সর্ব্বদা মনোযোগী থাকিতেন। ছেলেমেয়েদের জন্য মাত্র যৎসামান্য দুধ হইলেও পিতার জন্য আধসের দুধ বাঁধা ছিল। তিনি নিজে ও বাড়ীর অন্যেরা মাছ-মাংস না খাইলেও পিতার জন্য নিয়মিত কিছু আমিষের ব্যবস্থা তাঁহার করা ছিল। এই রকম সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার লক্ষ্য ছিল যাহাতে পিতার কোনরূপ অভাব অসুবিধা না হয়।

দিল্লি মেল নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিয়াছে, জানলার বাহিরে চেয়ে আছি। সবই শান্ত স্তব্ধ। ক্ষীন চন্দ্রালোকে মোহিত হইয়া শুন্য মাঠ শুইয়া আছে। গাছগুলি স্তব্ধ হয়ে উর্দ্ধমুখে আকাশের উজ্জ্বল তারার দিকে চেয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির এই শান্ত নীরবতার দিকে চেয়ে থাকিলেও মনে সেরূপ শান্ত নীরবতা ছিল না। ট্রেন সামনে বেগে ছুটে চলেছে, মন সেই বেগে পিছনে অতীতের দিকে ছুটে চলেছে। একের পর এক ঐ সব পুরোন কথা মনের সামনে ভেসে আসছে। মা সঙ্গে নেই, এই অন্ধকার নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহা বার বার অনুভব করছি। ছেলেবেলা থেকে প্রতিদিনের কথা এক এক করে মনে আসছিল। বাল্যকাল থেকেই আমার রামায়ণ মহাভারত শুনতে বড় ভাল লাগে। শুনতে ভাল লাগে পড়তে তেমন নয়। ছেলে বেলা অসুখ বিসুখ হলে মাকে বলতুম মা মহাভারত পড়। মা যদি রান্না বান্নায় থাকতেন, আসতে না পারতেন, তো বলতুম তাহলে অঙ্কের বইটা দাও। যতক্ষন না মা আসতেন ততক্ষণ অঙ্কের কোন problem নিয়ে ভাবতুম। নিজে রামায়ণ মহাভারত পড়তুম না। মার কাছে রামায়ণ মহাভারত শুনে এমনই জানা হয়ে গিয়েছিল যে রামায়ণ মহাভারতের পরীক্ষা হলে হয়ত পুরো নম্বরই পেতুম। শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইবার আগে স্মৃতি শ্রুতিই ছিল। স্মৃতি শ্রুতির মতই আমারও রামায়ণ মহাভারতের জ্ঞান। মহাভারতের মত কোন বই-ই আমাকে

মুগ্ধ, ভাবপ্রনোদিত করেনি। বড় হয়েও বরাবরই নিত্য রাত্রে খাওয়ার পর মার কাছে মহাভারত শুনতুম। মনের অবসাদ বিষাদ সরাতে মহাভারতের মত আর কিছুই এখনও পাই না। ট্রেন চলেছে বাহিরে শুন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। অতীতের স্মৃতি মনে অবসাদ নিয়ে আসছে। মার কাছে এ সময় মহাভারত শুনিলে এ অবসাদ চলে যেত।

গাড়ীর গতি ধীর হচ্ছে, বর্দ্ধমান আসছে। এই মোটে বর্দ্ধমান, সুদূর পথ সামনে। সঙ্গে আছে একটি বালক, বয়স এগার বছর নয় মাস। আর সঙ্গে হবেন গয়া থেকে একজন পুরোহিত নাম সত্যসিন্ধু ভট্টাচার্য্য ও ভারত সেবাশ্রমের একজন স্বামিজী। পুরোহিত মহাশয়কে সঙ্গে নিচ্ছি মানস সরোবর, কৈলাশ ও গৌরীকুণ্ডে ক্রোয়া কর্ম্ম করাইবার জন্য। স্বামিজীর বড় যাইবার ইচ্ছা বলেছিলেন, সেজন্য তাঁকেও নিয়ে যাচ্ছি। ওঁরা দুজন পরে বেনারসে Doon Express এ মিলিত হবেন। আমরা দিল্লী মেলে যাচ্ছি। ওঁরা গয়া স্টেসনে ভোর চারটের সময় দেখা করতে আসেন। দিল্লী মেলে গয়া থেকে কাশীর যাত্রী নেবে না। ওঁরা সেজন্য ঘণ্টা দুয়েক পর Doon Express য়ে আসবেন। আমরা মোগলসরাইতে নেবে কাশী গিয়ে স্নান দর্শন করে ওঁরা যে Doon Expressএ আসবেন তাইতে উঠব। এইরকম বলে দিলুম।

সেই রকমই হল। আমরা চারজনে বেনারসে Doon Express এ মিলিত হয়ে লক্ষ্ণৌ চললুম। সেখানে গাড়ী

বদল হবে। ছোট লাইন দিয়ে via Pilibhit টনকপুর যাওয়া, সেখান থেকে busএ পিথোরাগড় পর্যন্ত। টনকপুর ছোট জায়গা, কালীগঙ্গার ধারে। আমরা এখানে একটা ধর্ম্মশালার মত বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। সকালে এখান থেকে পিথোরাগড়ে যাবার বাস ছাড়বে।

৩

সকালে bus stand এ গিয়ে দেখি এত ভীড় যে টিকিট পাওয়া দূরূহ। দেখতে দেখতে দু-তিন খানা bus এর যাত্রী হয়ে গেল, আমি টিকিট পেলুম না। যাত্রী ভরা বাস গুলি ছেড়ে গেল। টিকিট অফিসে একজন বলিল "লোহাঘাটে ঐ বাস গুলির অনেক যাত্রী নেবে যাবে, সেখান থেকে পিথোরাগড়ে যাবার bus এ সিট পাবে। এখান থেকে লোহাঘাট পর্য্যন্ত একটা special bus করে নাও।" আমি অগ্রসর হইতে বড় ব্যস্ত, একদিনও নষ্ট করতে চাই না। আমরা ছিলুম চারজন, বাকি সিটে লোহাঘাট পর্য্যন্ত ভাড়া দিলে একটা বাস আমাদের নিয়ে যাবে। তারা এও বলিল যে পথে যদি কেহ bus-য়ে ওঠে ত তার ভাড়াটা আমিই নিতে পারব। আমি রাজী হলুম ও শীঘ্র একটি bus আনতে বললুম। লোহাঘাটে পৌঁছে পিথোরা-গড়ের bus ধরতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা একটা bus এ বসে রওয়ানা হলুম। পথে দু চার জন bus য়ে উঠিল,

bus conductor তাহাদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে আমাকে দিয়ে দিল। পরে কিন্তু দু-চার জনের ভাড়া দেয় নি।

পিথোরাগড়ে নেবে দুজন কুলি ঠিক করেই এগিয়ে পড়লুম। আর গাড়ী ঘোড়ার হাঙ্গামা নেই, এখন মুক্ত স্বাধীন ভাবে হাঁটা। পিথোরাগড়ে রান্না খাওয়ার জন্য তেমন কোন পরিষ্কার জায়গা নেই। তাই মনে করলুম একটু এগিয়ে ভাল জায়গা পাব। মাইল দুই এগিয়ে একটা ছোট দোকান, পাশে জলের ধারা। বেশ পরিষ্কার জায়গা, এখানেই রান্না-খাওয়ার জন্য বসলুম।

খাওয়ার পরে স্বামিজী বলিলেন খেয়ে উঠেই চলা ঠিক নয়, কিন্তু বসাও যায় না। কতদূর গিয়ে সন্ধ্যার আগে রাত্রে থাকবার জায়গা পাব জানা নেই, সেজন্য উঠে পড়লুম। অল্প অল্প চড়াই, হাঁটতে আমার বেশ ভাল লাগল। পাহাড়ে হাঁটতে আমার খুব ভাল লাগে। নতুন জায়গা, আগে এদিকে আসিনি, সেজন্য আরও ভাল লাগছিল। প্রথমবার এ পথে যাইনি, আলমোড়া হয়ে গিয়েছিলুম। এপথ আলমোড়া থেকে যে পথ এসেছে তার সঙ্গে ধারচুলার কাছে গিয়ে মিশবে। সন্ধ্যার একটু আগেই রাত্রে থাকবার বেশ ভাল জায়গাই পেলুম। বেশ বড় গ্রাম, কয়েকখানা পাকা ঘর ও দোকান আছে। সব জিনিষই পাওয়া যায়। প্রথম দিনের চলা এখানে শেষ। বেশ ভালই এসেছি, থাকবারও বেশ জায়গা পেয়েছি। পাহাড়ে চলা প্রত্যুষেই ভাল, সে সময় চলতেও ভাল লাগে। ভোর রাত্রেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সকলকে ডেকে দিলুম। আমরা কেহই চা খাই

না, চায়ের নেশা নেই। রাত্রে করা পুরি ছিল, তাই খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

হিমালয়ে তীর্থ যাত্রায় কত লোক যায়, কিন্তু অতি অল্প লোকেই তার মধ্যে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। তাদের ভাব গতিক দেখে মনে হয় যেন তাদের কেবল এই চিন্তা যে কি করিয়া তাড়াতাড়ি দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরবে। হিমালয়ে সর্ব্বত্রেই যে তীর্থস্থান তাহা তারা মনে করে না। এই সব যাত্রীরা এইজন্য একবার কোন প্রকারে হয়ে এলে আর যাবার কথা মনেও ভাবেনা। এবং তারা ফিরে এসে পথের এমন কষ্টের ও দুর্গমতার বর্ণনা অন্যদের শোনায় যে যাহারা শোনে তাহারা যেতে ভরসা পায় না। অথচ হিমালয়ের মত চিত্তাকর্ষক স্থান আর কোথায়? আমরা বছরে দুবার করে গিয়েও, প্রত্যেকবার প্রায় দেড় মাস করে, মনে হয় আবার কবে যাব। সকলকেই আমি হিমালয়ে যাইতে বলি, উৎসাহ দিই। কেবল হিমালয়ের সৌন্দর্য্য দেখতেই নয়, হিমালয় মনে যে ভাব আনে সেই ভাব পেয়ে অনুভাবিত হইতেও।

ভোরে বেরলুম। কতদূর আজ যাওয়া হবে তার কোন পাকা ঠিক নেই। যতটা যেতে পারা যাবে ততটা যাওয়া, তবে ধারচুলা আজ পৌঁছতে পারা যাবে না। ধারচুলায় রায় সাহেব প্রেম বল্লভকে দেখতে আমি উদগ্রাব ছিলুম। কিন্তু পরদিন সেখানে পৌঁছে তাঁর ছেলের কাছে শুনলুম তিনি নেই। তাঁর স্ত্রীও তখন ধারচুলায় নেই, লোহাঘাটে আছেন। শুনে মন খারাপ হয়ে গেল।

রায় সাহেব প্রেম বল্লভের আন্তরিকতা, তাঁর আদর ও যত্নের প্রতি বিষয়টি মনে আসিল। তাঁর ছেলেও খুব যত্ন করিল।

ধারচুলা মাত্র ৩০০০ ফিট উঁচু, সেজন্য এখানে ঠাণ্ডা নেই। এখান থেকে মাইল দশেক আগে খেলা, কিন্তু প্রায় সবটাই চড়াই। খেলা ৫৫০০ ফিট উঁচু। খেলাতে প্রথমবার পোষ্ট অফিসের এক অংশে ছিলুম। এবার ধর্ম্মশালায় উঠলুম। পাশের ঘরে আর একজন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন লোক। শুনলুম ইনি কয়েকদিন এখানে আছেন, বাড়ীতে কিছু টাকা পাঠাতে লিখেছেন, সেই টাকা আসার অপেক্ষায়। এঁকে দেখে, এঁর পোষাক জিনিষ পত্র দেখে বা সঙ্গীদের দেখে মনে হল না যে ইনি কোন অভাবে বা মুস্কিলে পড়েছেন। অথচ আমরা যখন সকালে রওয়ানা হচ্ছি তখন আমাদের নিকট সাহায্য চাইলেন। চাওয়াটা সামান্য কিছু নয়, বেশ ভাল রকমই। অনেকেরই এইরূপ নিজের অভাব জানান ও সাহায্য চাওয়া অভ্যাস ও প্রকৃতি। ইহারা অভাবে নয়, লোভে চায়। যাহাদের লোভ নেই, আত্মসম্মান আছে, তাহারা শত অভাব থাকিলেও অভাব প্রকাশ করেনা, করতে পারে না, আর সাহায্য কেহ দিতে এলেও নিতে পারে না।

খেলা থেকে মাইল ছয়েক গিয়ে পঙ্গু। খেলার উচ্চতা ৫,৫০০, ফিট এবং পঙ্গুর প্রায় সাড়ে ছয় হাজার। এই পঙ্গুতে প্রথমবার মা ও আমি ফেরৎ পথে রাত্রে ছিলুম। আমাদের সঙ্গে এলুমিনিয়ামের একটি বোয়েম ছিল তাতে মা গুড় পাপড়ি

রেখেছিলেন। দোকানদারের মা বা স্ত্রী ঠিক মনে নেই ঐ বোয়েমটি দেবার জন্য বলেন, কিন্তু আর কোন পাত্র না থাকাতে আমরা দিয়ে আসতে পারিনি। আমার সে কথা মনে ছিল ও সেইজন্য সেই বোয়েমটি এবার সঙ্গে এনেছিলুম, সেখানে তাকে দিয়ে আসব বলে। কিন্তু এখানে এবার মনে করে সেই দোকানে গিয়ে দোকানদারকে চিনতে পারলুম কিন্তু তার মা বা স্ত্রীকে চিনলুম না। তের বছর আগে আমাদের ওখানে থাকার কথা বলাতে কেহ মনে করতে পারল না। পঙ্গুতে আমরা দাঁড়ালুম না, রান্না খাওয়া সেরে এগিয়ে গেলুম। ফেরত আসিবার সময় আমরা এখানে রাত্রে ছিলুম ও সেই সময় সেই বোয়েমটা দোকানদারের স্ত্রীকে দিয়ে আসি।

৪

পঙ্গু থেকে যুঙ্গতিধার নদী পর্য্যন্ত মাইল খানেক নাবাই, তারপর কাঠের পুলের ওপারে স্নুসার দু মাইল চড়াই। বেশ চড়াই। স্নুসার উচ্চতা ৮৪০০ ফিট। স্নুসা থেকে তিন মাইল পুর্ব্বে দক্ষিণ ভারতের শ্রীনারায়ণ স্বামীর সারদা আশ্রম। প্রথমবার যখন আমরা তাকলাকোট পৌঁছই তার দিন দুয়েক আগে এই নারায়ণ স্বামী সদলবলে কৈলাশ চলে গিয়েছিলেন। তখন নন্দরাম বলেছিল তোমরা যদি দুদিন আগে আসতে ত ওঁর সঙ্গে করে দিতুম।

যুঙ্গতিধার নদী দরমা পাহাড় থেকে আসছে। দরমা-পাস দিয়েও তিব্বতের এক পথ আছে। সুসাতে এক ধর্ম্মশালায় আমরা রাত্রে রইলুম। এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে সিরকা। প্রথমবার দেখেছিলুম সিরকায়ে থাকবার স্থান ভাল নেই। সেখানে সেজন্য দাঁড়াব না ঠিক করেছিলুম। সুসা থেকে সিরকার পথ অতি মনোরম। দুধারে দেওদার গাছ তার ভিতর দিয়ে পথ। দুমাইলের পর সিরকায় পথ নেবে গেছে। সিরকা বেশ বড় গ্রাম, আর বড় গ্রাম বলেই নোঙরা। এখানে খাবার দ্রব্য সবই পাওয়া যায়। আলুর চাষও খুব। সিরকার ভিতর দিয়ে পথ চলে গেছে, তারপর মাঝারি চড়াই, কিন্তু চারিদিকের দৃশ্য বড়ই চমৎকার। বনের ভিতর দিয়ে চলেছি মাঝে মাঝে জলের ধারা কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছে। সুমারিয়া ধার (১০০০০) পর্য্যন্ত চড়াই তারপর উতরাই জিপতি পর্য্যন্ত (৮০০০)। সিরখা থেকে জিপতি এগার মাইল। এখানে একটি বেশ ধর্ম্মশালা, তাইতে উঠলুম। আগের বারে এখানে থাকিনি, এগিয়ে গিয়ে মালপায় ছিলুম। মালপায় থাকবার স্থান বড় খারাপ সেজন্য এবার মালপায় থাকব না ঠিক করেছিলুম। জিপতি থেকে গারবিয়াং পর্য্যন্ত রাস্তা খারাপ। খানিকটা গিয়ে খাড়া উতরাই তারপর খাড়া চড়াই। পথও পাথরে কাটা সিঁড়ি সিঁড়ি, সমান নয়।

মাইল চারেক গিয়ে একটা কাঠের পুল পার হয়ে কালীগঙ্গার ডান ধার দিয়ে পথ চলল। আর একটু গিয়ে এক জল প্রপাত। প্রায় ৫০ ফুট ওপর থেকে জল পড়ছে। পাশেই এক প্রশস্ত গুহা

যাহার মধ্যে ভোটিয়ারা ছাগল ভেড়া নিয়ে রাত কাটায়। আবার খাড়া উতরাই, খাড়া চড়াই। এই ভাবে আর দেড় দু মাইলের পর এল আর এক বিরাট জলপ্রপাত, Nijang Falls. একে জল প্রপাত বলা যায় না। এ একটা নদী, ৩০ ফিট কি বেশি চওড়া, এসে খাড়া প্রায় ৭০ ফিট নিচে এসে পড়ছে আর গিয়ে কালী গঙ্গায়ে মিশছে। দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখতে হয়।

এখান থেকে আবার খানিকটা খাড়া চড়াই তারপর প্রায় সমান চলে গেছে মালপা পর্য্যন্ত। মালপায় থাকবো না স্থির ছিল, সেজন্য এখানে অল্পক্ষণ থেকে এগিয়ে চললুম। এখান থেকে সরু পাহাড়ের গা দিয়ে পথ, নিচে নদী। দু পাশে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছ পালা নেই। সন্তর্পনে এক এক জন করে চলতে হয়। সামনে থেকে কেহ এলে পাহাড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়াতে হয়। আকাশ পরিষ্কার, পাহাড়ের উপর রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। দু এক জায়গায় রাস্তা ভাঙ্গা, নদী পর্য্যন্ত নেবে আবার মাটি বালি পাথরের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে রাস্তায় উঠতে হল। মালপা থেকে বুধি প্রায় নয় মাইল। আমরা চলে চললুম। মালপা আর বুধির মাঝে কোথাও থাকবার কোনরূপ আশ্রয় নেই। জিপতি থেকে বুধি প্রায় ১৭ মাইল। আমরা ভালই চলে এসেছি। বুধির স্কুল ঘরে গিয়ে উঠলুম। এখানে সকলকে রেখে আমি এখানকার ভোটিয়াদের জিজ্ঞেস করতে গেলুম কৈলাশ মানস সরোবর যাইবার বিষয়। এখানকার

বিশিষ্ট ভোটিয়া সদাগর দৌলৎরাম বলিল এখন লিপু বরফাচ্ছন্ন, যাওয়া যাবে না। এবার কুম্ভ মেলা। এ কুম্ভ মেলা এলাহাবাদের কুম্ভ নয়। কাল চক্র জ্যোতিষ অনুসারে যাট বৎসরের এক চক্রকে তিব্বতীতে রবিইউঙ্গ বলে, তাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে বার বৎসর হয়। এই বার বার বৎসর অন্তর এই কুম্ভ মেলা। এই মেলা কৈলাশের নিকট সেরসাঙ্গে হয়।

বুধি বেশ বড় ভোটিয়া গ্রাম, অনেক ঘর বাড়ী। দৌলৎ-রাম বলিল এবার কুম্ভ, আমরা সব যাব, কিন্তু অন্ততঃ পনের দিন পর। "অভিতো উধরসে বক্রীভী নহি আয়া" অর্থাৎ এখনও ত ওপার থেকে, অর্থাৎ তিব্বত থেকে, ভেড়া আসেনি। ওপার থেকে বরফের উপর দিয়ে যখন ভেড়া আসে তখন ভেড়ার খুরের ছাপ বরফে যেখানে পড়ে সেইখানে বরফ প্রথম গলতে আরম্ভ হয়। আর ঐ খুরের ছাপ পথও দেখিয়ে দেয়, নচেৎ লিপুর উপর দিয়ে পথ চেনা যায় না।

পনের দিন এখানে অপেক্ষা করাও কঠিন। চিন্তিত হয়ে স্কুলে ফিরে এলুম। ভাবলুম একবার গারবিয়াংয়ে খোঁজ নিতে হবে। সকালে একজন কুলিকে বললুম গারবিয়াংয়ে গিয়ে সব জেনে আসতে। যদি ১৫ দিন থাকতেই হয় ত গারবিয়াংয়ের অপেক্ষা বুধিতে থাকাই ভাল। এখানে ঠাণ্ডাও কম, থাকবার জায়গাও ভাল। সত্যসিন্ধু বাবু বলিলেন উনিও কুলির সঙ্গে যাবেন। আমি বললুম "বেশ ঘুরে আসুন।"

বুধি আশে পাশে ছড়ান বেশ বড় গ্রাম। স্কুল ঘরটিও বেশ ভাল, পরিষ্কার। গারবিয়াং এখান থেকে মাইল চার পাঁচ। প্রথমে খানিকটা খাড়া চড়াই, প্রায় হাজার দুই ফিট, তারপর একটু নাবাই, পরে প্রায় সমান। সত্যসিন্ধু বাবু ও কুলির অপেক্ষায় আমরা রইলুম। কিন্তু ওঁদের ফিরতে বেশি দেরি হয় নি। ওঁরা এলে খাওয়া দাওয়া হল ও ওখানকার বৃত্তান্ত জানা গেল। খবর এই যে একজন গাইড বলেছে যে যদি আমরা রাত্রি ২টার সময় লিপুর নিচে থেকে রওয়ানা হই তাহলেই প্রত্যুষে লিপু পার হওয়া যেতে পারে। সূর্য্য উঠিলে সূর্য্যের তাপে বরফ নরম হবে, গলতে আরম্ভ হবে, সে সময় বরফের উপর চলা বিপজ্জনক। আমি বললুম তাই হবে, পনের দিন ত এখানে থাকা যায় না। সকলেই রাজী।

পরদিন সকালে গারবিয়াং চললুম। প্রথমবার যেখানে ছিলুম সেই ধর্ম্মশালায় গিয়ে উপরে উঠলুম। নিচের তলায় থাকবার মত নয়। দুখানা ঘর, মন্দের ভাল, একখানা ভরতি আর একখানা খালি। সেটাই দখল করলুম। সকলকে এখানে রেখে আমি গেলুম ভোটিয়া দলীপসিংয়ের বাড়ী। শুনলুম নন্দরাম, দলীপ সিং, কেহই নেই। তাদের এক ভাইয়ের ছেলে ছিল, এই এখন কর্ত্তা। সে আমার আগের পরিচয় শুনল ও খুব সাদরে বসাইল। এর নাম বিজয়সিং (?)। সঠিক মনে নেই। এর বোন আলমোড়ায় এক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী ও ভগ্নিপতি আলমোড়ায় এক কলেজের শিক্ষক। বিজয়সিং

এক গাইডকে ডাকাইল। গাইডের নাম রতনসিং। সে বলিল প্রথম অসুবিধা কুলি পাওয়া। যে কুলিরা এখান পর্য্যন্ত এসেছে তারা আর ওপরে যাবে না। এখান থেকে তিব্বতী কুলি নিতে হবে, কিন্তু এখনও তিব্বতীরা ওপার থেকে আসেনি। দ্বিতীয়, লিপুর বরফের উপর দিয়ে রোদ উঠিবার পূর্ব্বেই পার হতে হবে। কুলির সমস্যাটি ভাববার। রতনসিং খোঁজ করতে বল্লে।

পথের জন্য যা জিনিষ দরকার তা বিজয়সিংয়ের কাছেই পাওয়া যাবে। তিন সপ্তাহের মত সকলের জন্য খাদ্য, তারপর গরম কাপড়। ঠাণ্ডা কি রকম কল্পনা করা কঠিন নয়। লিপুর উচ্চতা ১৬৭৫০ ফিট, আর গৌরি কুণ্ডের ১৮৬০০। কেবল উচ্চতাই নয়, এ সময় সব বরফে ঢাকা। তিনখানা মোটা এখানকার কম্বল যাকে বলে থুলমা তাই নিলুম। একখানা পেতে আমাদের চারজনের শোবার ও আর দুখানা আমাদের দুজন করে গায়ে ঢাকার। আমাদের সঙ্গে আনা কম্বলও রইল। আরও নিলুম ভেড়ার skin এর পাজামা, লম্বা কোট ও টুপি। ইহা খুব গরমও হয় আর বরফে বৃষ্টিতে ভেজেও না। একটা তাঁবুও নিলুম। সমস্যা রহিল কুলির। সেদিনটা আর কিছু হল না। ধর্ম্মশালার ঘরটা ছোট। মোটেই ভাল নয়। তবে উপায় নেই। সকালে উঠে দেখি আমাদের পাশের ঘরে যে ছিল সে বাহিরে বসে। সে তিব্বতী। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম সে এখানে কি করে। সে বললে কিছু

তিব্বতী বরফ পার হয়ে এদিকে এসেছে কার্য্যের সন্ধানে। আমি গাইডকে আর বিজয়সিংকে খবর দিলুম যে এখানে তিব্বতী এসেছে। তারা এসে একে সব জিজ্ঞাসা করে জানিল যে গারবিয়াংয়ে আরও কয়েকজন তিব্বতী আছে। এই লোককে তখন বললুম চারজন তিব্বতী আমাদের প্রয়োজন। কথা ঠিক করে নিশ্চিন্ত হলুম ও এখান থেকে যে সব জিনিষ নেওয়া হল সেসব গুছিয়ে নিলুম। এখানে বেড়াবার দেখবার তেমন কিছু নেই। আমার ত ভাল লাগল না। পরদিন সকালে চলতে হবে। প্রত্যুষেই উঠে প্রস্তুত হয়ে বাহিরে গাইডের অপেক্ষায় দেখতে লাগলুম। বেলা হয়ে যাচ্ছে, ব্যস্ত। কিন্তু কাহাকেও দেখছি না। গাইডই বা কোথায়, আর কুলিরাই বা কোথায়। পরে গাইড রতনসিং এল কিন্তু কুলিদের দেখা নেই। পরে যে তিব্বতী পাশের ঘরে ছিল ও যে চারজন তিব্বতীকে আনবে বলেছিল সে এল ও বললে তাদের মধ্যে একজন যেতে পারবে না। তিনজন আছে। তিন জনে ত আমাদের হবে না। সে বললে আজ আর হবে না কাল চারজন পাওয়া যাবে। উপায় নেই, তবে তার কাছে নিশ্চিত করে নিলুম যে কাল চারজন আসবে। সেই চারজনকে আজ একবার নিয়ে আসতে বললুম। জিনিষপত্র বাঁধা হয়েছিল, সে সব আবার খোলাখুলি করতে হল।

বিজয়সিংয়ের বাড়ী গিয়ে সব বললুম। সে বললে আর

কি করা যাবে। এখন ত তিব্বতী কুলি পাবার কথাই নয়। পাওয়া গেছে এই ভাল। সে আরও বলিল সব টাকা সঙ্গে না নিয়ে যাওয়াই ভাল। খরচের মত নিয়ে উপরোক্ত টাকা ওর কাছে রেখে যেতে পারি। তাই করলুম। পথ খরচের মত আন্দাজ করে টাকা সঙ্গে রেখে বাকিটা ওর কাছে রেখে দিলুম।

বাইরে এসে একটু ঘোরা ঘুরি করলুম। এখানে একটা স্কুল আছে যেমন আরও স্থানে স্থানে আছে। তবে ভাল স্কুল বাড়ীর চেয়ে ভাল শিক্ষকেরই বেশি দরকার আর সেইটেরই সুস্পষ্ট অভাব, কেবল পাহাড় অঞ্চলেই নয় অন্যত্রও। এমন কি বড় বড় কলেজ ইউনিভারসিটিতেও। Scholar ও ডিগ্রি-হোল্‌ডার আছে কিন্তু প্রকৃত বিদ্যানুরাগী বড়ই অল্প যাঁহারা নিজের বিদ্যানুরাগ ছাত্রদের মধ্যে দিতে পারেন। খুব কম শিক্ষকই রুটিন কাজ ও টিউসন ছাড়া নিজেরা লেখা-পড়া, চিন্তা গবেষণা করেন। ডিগ্রি পাওয়াতে কিছু নেই। ডিগ্রী লইয়া ইউনিভারসিটি ছাড়িবার পরই প্রকৃত বিদ্যা চর্চ্চার সময়। তার পূর্ব্বে পরীক্ষা পাস ও তার জন্য পরীক্ষার বইতেই সময় ও মন দিতে হয়। ডিগ্রি সে যত উচ্চ ও যত প্রকারই হউক না তাহাতে বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিদ্যার পরিচয় ব্যক্তির জীবনে, তাহার কথায় ও চিন্তার ধারায় পাওয়া যায়। অমুক বইতে এই আছে, অমুক বইতে ঐ আছে, এটা বলতে পারায় কিছু বিশেষ কৃতিত্ব নেই। নিজস্ব চিন্তা,

ও বিচার করার ক্ষমতা না থাকলে ডিগ্রি পাওয়া বিদ্যা বৃথা। এই প্রকার শিক্ষক মাত্র নোট ডিক্টেট্ আর Questions Answers ই করাতে পারেন। ছাত্রদের ভিতর জ্ঞানের ঔৎসুক্য জাগাতে পারেন না। অনেকটা সেই কারণে ছাত্রদের ক্লাস ভাল লাগে না ও তারা বাহিরের উশৃঙ্খলতায় ভেসে যায়।

৫

পরদিন সকালে উঠে ভাবলুম আজও কি কালকের মত কুলিরা আসবে না। কিন্তু আজ তারা এল। মালপত্র বাঁধা ছাঁদা হল। বিজয়সিং এসে কুলিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে সব ঠিক করে দিল ও কাঁটা আনিয়ে জিনিষ ওজন করাল। এক এক জন কুলি ২০ সের ওজন লইবে। কিছু আলু নেওয়া হয়েছিল। তার কিছুটা কুলিদের মোটের উপরন্তু হচ্ছিল। আমি তাহা সরিয়ে রাখলুম আর সকলকে বললুম যে কুলিদের উপর উহা চাপান হবে না। আলু নিতে হলে আমাদেরই তাহা পকেটে বা অন্যভাবে বইতে হবে। কিছু কিছু সকলে পকেটে লইলেন। বাকিটা ছেড়ে দেওয়া হল। সব বন্দোবস্ত করে বেরোতে বেশ খাণিকখন লাগল কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে বেরলুম।

গারবিয়াং থেকে বেশ খাণিকটা খাড়া নাবাই কালীগঙ্গা পর্য্যন্ত। এইখানে একটা কাঠের পুল পার হয়ে ওপারে যেতে

হয়। প্রথমবার আমি এখানে এসে এই পুল পার না হয়ে কুঁটি নদীর ধার দিয়ে যে পথ কুঁটি গ্রামে গেছে সেই পথ দিয়ে চলে গিয়েছিলুম আর মা পুল পার হয়ে কালাপানির দিকে গিয়েছিলেন। ১২ মাইল গিয়ে কালাপানি (১২০০০ ফিট্)।

কালাপানি বড় সুন্দর জায়গা। একটি পরিষ্কার জলের ঝরণা, তার পাশে তাঁবু ফেলে থাকবার মত। এর প্রকৃত নাম ভগবতি কালী হইতে। কিন্তু নাম হয়ে গেছে কালাপানি, যদিও জল কাল নয়, সুন্দর পরিষ্কার। এই ঝরণাকে বলে কালী নদীর উৎস। কিন্তু তা নয়, কালী নদী আসছে লিপু হইতে। আমরা এখানে তাঁবু ফেললুম।

সকালে রওয়ানার সময় রতনসিং বলিল এখান থেকে কিছু কাঠ কেটে নিতে হবে কারণ যেখানে গিয়ে রাত্রে থাকব সেখানে কাঠ পাওয়া যাবে না। গাছের ডাল ভাঙ্গা হল। কিন্তু আমি বললুম কুলির উপর চাপান হবে না। ভাগাভাগি করে আমাদের নিতে হবে। যে যা পারলুম নিয়ে চললুম। একটু গিয়েই একটি ছোট নদী, তার উপর কাঠের পুল। আরও একটু গিয়ে আবার কালী নদী পার হয়ে পথ। তারপর মাইল খানেক খাড়া চড়াই। প্রায় মাইল পাঁচেক গিয়ে নগভিদাঙ্গ বলে একটা জায়গা। কেহ নেই কিন্তু গোটা দুয়েক ছোট ঘর। এখান থেকে আর খানিকটা গিয়ে রতনসিং দাঁড়াল। এখানেই তাঁবু পড়বে।

একটু সমতল জায়গা দেখে জিনিষ পত্র নাবাইল। এখানে খুব ঠাণ্ডা। বেলা পড়ে এসেছে। যেখানে তাঁবু পড়ল তার পাশেই জমাট বরফের স্তুপ, অপর পাশে একটু নিচে এক বরফ গলা জলের স্রোত। আমি সেখানে নেবে হাত মুখ ধুয়ে গায়ত্রী জপে বসলুম। ঐ জলে হাত দেওয়ায় হাতের আঙ্গুল হিম হয়ে গেল, ভিতর থেকে জ্বালা করতে লাগল। তাঁবুর ভিতর এসে কম্বল ঢেকে বসার কতক্ষণ পর সেই জ্বালা গেল। এদিকে বালক বরফের উপর খেলা করিতে লাগিল। খানিকটা ওঠে আর slip করে নেবে আসে।

আমরা চা খাইনা, সত্যসিন্ধু বাবুরও চায়ের নেশা নেই, হলে খান। গারবিয়াংয়ে চা কেনা হয়েছিল। সে কাগজের প্যাকেটের চা নয়, খোলা যেমন তামাকের পাকান ছোট বাণ্ডিল হয় সেই রকম। দুধ নেই, এই কড়া চা raw খেতে হয়। তাঁবুর ভিতর আমরা রান্নার জোগাড়ে বসলুম। আজ এখান থেকে রাত দুটোর মধ্যে চলতে হবে। কি ঠাণ্ডা, যদিও এখন লেখবার সময় সেদিনের ঠাণ্ডাটা যত বেশি মনে হচ্ছে সে সময় তত বোধ হয়নি। তার কারণ তখন ঐ ঠাণ্ডা দেশে দিনের পর দিন থাকায় ঠাণ্ডাটা যেন গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল, ঠাণ্ডার দিকে অত মনও থাকত না। ঠাণ্ডা যেমনই হোক্ তাকে মেনে নিতে হত। তাঁবুর ভিতর আমরা চারজন ও গাইড শুলুম, কিন্তু তিব্বতীদের তাঁবুর ভিতর আসতে বলা সত্ত্বেও তারা এল না, বাহিরে রহিল। কৈলাশের পিছনে প্রায় ১৯০০০ ফিট উচ্চে আমাদের তাঁবু

পড়েছিল সেদিনও তিব্বতীদের বলা সত্ত্বেও তারা তাঁবুর ভিতর না এসে বাহিরে শুয়েছিল। তাও কি ভাল গরম কিছু পেতে ঢেকে শোওয়া। একটা সামান্য কম্বল পেতে ও তাই জড়িয়ে খোলা আকাশের নিচে অত উচ্চে ঠাণ্ডায় তারা নাক ডেকে স্বচ্ছন্দে শুয়েছিল। ঠাণ্ডায় তাহারা এমনি অভ্যস্ত যে ঠাণ্ডাকে আর তাহারা ভয় করে না, ঠাণ্ডাকে ঠাণ্ডা বোধ করে না।

রাত্রি দুটোর সময় যদি রওয়ানা হতে হয় ত অন্তত একটার সময় উঠতে হয়, কারণ উঠে এসব বাঁধা ছাঁদা করা, তাঁবু খোলা ও তারই মধ্যে কিছু খেয়েও নেওয়া, এ সবই সারতে হবে। মাথার কাছে দেশলাই মোমবাতি ও ঘড়ি নিয়ে শুলুম। বিছানা ঠাণ্ডা কনকনে। প্রথমে ঘুম আসছিল না, ঠাণ্ডাতেই হোক বা উচ্চতার কারণেই হোক্ বা ক্লান্তির দরুণই হোক। তবে শারীরিক কোন ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল না। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু দুটো না বেজে যায় মনে খট্‌কা ছিল সেইজন্য একটু পরেই ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে দেশলাই জ্বেলে ঘড়ি দেখলুম কটা বেজেছে। তখন মাত্র সাড়ে দশটা। আবার শুলুম। এবার ঘুম ভাঙল তখন সাড়ে বারটা হয়ে গেছে। আর শোওয়া ঠিক নয়। এবার শুলে দেরি হয়ে যাবে। সকলকে ডেকে দিলুম। কাঠ ধরিয়ে আগুন জ্বালা হল, তার উপর চার জল বসান হল, আর রাত্রে করা লুচি গরম করা হল। সে সময় কাহারও খাবার ইচ্ছে নেই, তবু কিছু খেয়ে নিতে হবে কারণ আবার কখন খাওয়া হবে তার ঠিক নেই। দু একখানা করে

পুরি নুন ও গুড় দিয়ে আমরা খেয়ে নিলুম, তারপর গুড় দেওয়া র' raw চা একটু খাওয়া হল, স্বামীজী চা খেলেন না। ভালই করলেন, কারণ আমাদের মধ্যে যাদের চা খাওয়া অভ্যাস ছিল না তাদের ঐ রাত্রে গরম চা খাওয়ায়ে প্রথমটা বেশ শরীরটা গরম হলেও পরে তাহার জন্য গা ঘোলায় এবং লিপুর উপর দিয়া যাইবার সময় বরফের উপর বশে রাত্রের খাওয়া নির্গত করিতে হয়। সেখানে জল নেই, বরফ খুঁড়ে, বরফের টুকরো নিয়ে শৌচ কাজ সারতে হয়।

তাঁবু খুলে ঐ রাত্রে ঐ বরফের রাজ্যে প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা হওয়া যে কি ব্যাপার সে বিনা অভিজ্ঞতায় কেহ অনুমান কেন কল্পনাও করিতে পারিবে না। এখন যখনই ঐ রাত্রের অভিযানের কথা মনে করি তখনই মনে হয় ঐ অভিযান অত্যন্ত দুঃসাহসীক ব্যাপার ছিল। ভেবে চিন্তে কেহই ঐ রকম দুঃসাহসীকতা করিতে পারে না। যাঁহারা mountaineer-ing করিতে পর্ব্বত শিখরে ওঠেন তাঁহারাও এই রকম দুঃসাহসীকতা বোধ হয় করেন না। কারণ তাঁহাদের থাকে পুরো (equipment), সরঞ্জাম, যাহা আমাদের ছিল না, আর তাঁহারা এরকম দুপুর রাত্রে অভিযানও করেন না। আজ লেখবার সময় সেই দিনের নৈশ অভিযানের ভীষণ দুঃসাহসীকতার কথা মনে হচ্ছে। কিন্তু সেদিন সে সময় ওরকম মনে হয়নি। এবারকার যাত্রায় কেবল মনে এই ছিল যে যাব, যেতেই হবে, যে ভাবেই হোক্। নচেৎ যখন ভোটিয়ারা

এই বরফ ভেদ করে যেতে প্রস্তুত নয়, আরও অন্ততঃ দিন পনের অপেক্ষা করবে, তখন আমি একবারও ইতস্ততঃ না করে রাত্রে চলতে হবে গাইড বলাতেও তাই চলব ঠিক করে একপ্রকার দুর্ভেদ্য বরফের মধ্যে প্রবেশ করতে দৃঢ় হতে পারতুম না, যেখানে মানুষ কেন কোন জীবেরই পদচিহ্ন নেই, পথ বা পথের কোন নিশানাই নেই। গভীর রাত্রের অন্ধকারে শীত না মেনে, ক্লান্তি না মেনে, কেবল চলা, আগে চলা—এভাবে কখনই যেতে পারতুম না যদি তখন যাবই, যেতেই হবে, এভাব মনে না থাকত আর ঐ ভাব মন থেকে সব ভয় ভাবনা দূরে রেখে বল ও একনিষ্ঠতা না দিত।

আমরা চারজন, গাইড ও চারজন কুলি, এই নয়টি প্রাণি একের পিছনে এক চলেছি। সামনে রতনসিং, তার হাতে মাত্র একটি হ্যারিকেন ল্যাম্প। আকাশ থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলো চারিদিকে বরফের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের চোখ নিচে, খুব সন্তর্পনে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চলতে হচ্ছে। কোথাও বরফগলা জলের ওপর দিয়ে, কোথাও বরফ, কোথাও পাথরের ওপর দিয়ে। আমি কয়েকবার পিছলে পড়লুম, কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠে আবার চললুম, সকলে চলে যাচ্ছে, পেছিয়ে না পড়ি। সমস্ত তিব্বতে কেন, সারা হিমাচল প্রদেশে ও বোধ হয় পৃথিবীতে কোথাও সে সময় গভীর নিশার স্তব্ধতা ভেদ করে আমাদের মত নয়জন আস্তে আস্তে সন্তর্পনে পা ফেলে, একের পিছনে এক, অনির্দ্দিষ্ট পথহীন পথে ক্ষীণ চাঁদের আলোয়ে একটা মাত্র

হ্যারিকেন ল্যাম্প সামনে নিয়ে কেহ চলেনি। অসীম আকাশের ভিতর থেকে স্তব্ধ হয়ে কতকগুলি নক্ষত্র আমাদের দিকে চেয়ে বোধ হয় ভাবছিল এরা পাগল না এরা কোন অসাধ্য সাধনায় ব্রতী। কিন্তু আমার তখন ওপর দিকে চেয়ে এই স্তম্ভিত তারার সহিত চোখাচোখি করবার অবকাশ বা মন ছিল না। এক আধ বারই ঘাড় সোজা করে আকাশে তাদের দিকে চেয়ে দেখেছি। সত্যই বোধ হয় আমরা পাগল, তবে কোন ব্রতই পাগল না হলে বোধ হয় সাধন হয় না।

চোখ নিচে রেখে চলেছি, একের পিছনে এক। কেবল চলেছি, চলে চলা ছাড়া আর কোন কথা মনে নেই। ভোরের মধ্যেই লিপু পার হতে হবে। বরফের উপর চলেছি, চারিদিকে সব জুড়ে বরফ, তবে চড়াই ধীরে ধীরে। লিপু ১৬৭৫০ ফিট। ক্রমান্বয় চড়াই। বরফ মাঝে মাঝে একটু নরম, পায়ের ছাপ পড়ছে, কিন্তু পা ধসে যাচ্ছে না। তবে খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। দুপুর রাত্রি থেকে চলা, তার উপর উচ্চতা (high altitude), জামা পোষাকের ভার এবং ভীষণ ঠাণ্ডা, এর একটা কারণেই পা চলে না। এখানে সব কারণই উপস্থিত। প্রতি পা-য়ই টেনে তুলে ফেলতে হচ্ছে। এইভাবে আস্তে আস্তে চলেছি। কুলিরা পিছনে ছিল, সত্যসিন্ধুবাবুও একটু পেছিয়ে। হঠাৎ তিনি ডাক দিলেন। কুলি চারজনের মধ্যে একজনের পিঠে কাণ্ডি, সেই কাণ্ডিতে বালক আসছে। সত্যসিন্ধুবাবু ডেকে বললেন বালক অস্বস্থি বোধ করছে। সন্ত্রস্থ হয়ে ফিরে চললুম, কিন্তু ছুটে যাওয়া

অসম্ভব, পা কিছুতেই জোরে এগোয়ে না। যথাসাধ্য চেষ্টায়, যথাসম্ভব জোরে বালকের কাছে গেলুম ও কাণ্ডি থেকে তাকে নাবালুম। রাত্রে ঘুম নেই, দারুণ ঠাণ্ডায় কাণ্ডিতে বসে আসা, এত high altitude, এত সব বালক অসাধারণ মনোবল থাকাতেই সহ্য করতে পেরেছিল। একটি কথা না বলে, একবারও আপত্তি না করে, মধ্যরাত্রের এই দুঃসাহসীক অভিযানে তার আসায় সকলেই আশ্চর্য্য হয়েছিল। আমি কিন্তু তাকে জানতুম, সেইজন্যই তাহাকে আনতে সাহস করেছিলুম। আমার মত তাহারও চা খাওয়া অভ্যাস ছিল না। মধ্যরাত্রে কড়া গরম চা খাওয়ায় আমার গা ঘোলাচ্ছিল, উহারও হয়ত ঐ রকম অস্বস্থি হচ্ছে ভেবে তাকে বরফের উপরই বসতে বললুম যদি মল বায়ু কিছু নিস্কাসিত হয়ে যায়। আমিও বসলুম। জল নেই, বরফ ভেঙ্গে তাই দিয়েই শৌচ কাজ সারলুম। অস্বস্থি ভাবটা অনেকটা চলে গেল। আস্তে আস্তে আবার এগলুম।

পূর্বদিক ফরসা হয়েছে, লিপু পাসও এসে গেছে। উঠে চললুম।

ওপার থেকে কয়েকজন খাম্পা একপাল ভেড়া নিয়ে আসছে। দূর থেকে দেখলুম তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। নিকটে এসে দেখি একটি ভেড়া প্রাণহীন পড়ে আছে আর খাম্পারা তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে তার দেহ খণ্ড খণ্ড করছে। আমার গাইড এসে বললে 'আমাকে চারটে টাকা দাও, আমি একটু মাংস কিনব।' টাকা

দিলুম, সে গিয়ে একটা ঠ্যাং কিনে তাহা কাপড়ে জড়িয়ে নিল। এই ঠাণ্ডায় মাংস পচে না। এখানে মাংস সিদ্ধ করা সহজ নয়। সিদ্ধ করা সম্ভব না হলে কাঁচা মাংসও এরা চিবিয়ে খায়। যেখানে আগুন করা সম্ভব হয় সেখানে কেটলি বসিয়ে জল ফোটায়, তাইতে চা ছেড়ে দেয় ও মাংসও টুকরো করে তাইতে দেয়।

ভেড়াটি পড়িতে পড়িতেই তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগাভাগি করে নিতে ওদের ব্যস্ততা দেখে আশ্চর্য্য হলুম। এই যে ভেড়াটি তাদের মোট বয়ে আনছিল, সে পড়ে গেল, কিন্তু তার জন্য তাদের মুখে দুঃখ শোকের লেশমাত্রও দেখলুম না। মুখে কেবল পশুটির মাংস খাইবার লোভ ও মাংসের ভাগ পাইবার ব্যগ্রতা। কোন পশুর মুখে কখন এরূপ বিকট লোভ দেখিনি সে যত ক্ষুদার্ত্তই না হোক্।

লিপু পার হলুম। এদিকে নাবাই, কিন্তু ওদিককার মতই বরফ। আমরা বেশ নাবতে লাগলুম। বালকও কাণ্ডি থেকে নেবে গাইডের সঙ্গে প্রায় দৌড়ে দৌড়েই নাবতে লাগল। ক্রমাণ্বয় নাবাই। সূর্য্য উঠেছে, আর অত ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না। জোরে নেবে চলেছি তাতে শরীর গরম হয়ে উঠল। এক টানায় নেবে চলেছি। সারা রাত্রির চলা, অনিদ্রা, ক্লান্তি, কিছুই যেন এখন নেই। মাঝে মাঝে পা পিছলে বরফের ওপর খসকে বেশ ক্ষাণিকটা নিচে গিয়ে পড়ছি, কিন্তু লাগছে না, আর বরফ শক্ত বলে কাপড় চোপড় ভিজছে না। এখন

লেখবার সময় সেদিনকার ঠাণ্ডা, আর ক্রমান্বয় বরফের ওপর দিয়ে নেবে যাওয়া যেমন মনে ও চোখের সামনে আসছে অমনি আতঙ্কের সহিত আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে যে কি করে তখন গিয়েছিলুম। কিন্তু তখন ১৬৭৫০ ফিট চড়াইর পর ভোরের আলোয় নাবাই পেয়ে আতঙ্কের পরিবর্ত্তে বরং একটা উল্লাসই মনে এসেছিল।

চড়াইরও যেমন বোধ হচ্ছিল শেষ নেই, নাবাইরও তেমন যেন শেষ নেই। নেবেই চলেছি। অনেকক্ষণ পর সমতল পথে এসে পড়লুম। পাহাড়ের ধার দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পর সামনে দেখতে পেলুম কয়েকটা তাঁবু। এ স্থানটার নাম পালা, কয়েকটি তাঁবু ভিন্ন এখানে আর কিছুই নেই। তাঁবুতে ছিল চীনেরা। এরা আমাদের জিনিষ পত্র দেখিতে চাহিল, আমরা সব খুলে দেখালুম। উহাদের নেতা আমাদের চা দিতে এল কিন্তু আমি বললুম আমরা চা খাই না।

এখান থেকে একটু গিয়ে একটা ছোট নদী এল, পার হয়ে চললুম। সমতল পথ। রোদ উঠেছে, ঠাণ্ডাও বোধ হচ্ছে না। দুপুর রাত হতে চলছি, কিছু খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। কাহারও কিন্তু সে কথা তখন মনে নেই। সামনে এল তাকলাকোট। নদীর উপরের পাড়ে ভোটিয়াদের তাঁবু। আগেরবার ঐ খানেই নন্দরামের তাঁবুতে ছিলুম। এবার এখনও ভোটিয়ারা আসে নি। গাইড নদীর অপর দিকে নদীর ধারে ধারে চলল। নদীর ধারে সমতল স্থান দেখে তাঁবু

ফেলল। ওপারে উপর দিকে ভোটিয়াদের তাঁবু, কিন্তু এই দিকটা পরিষ্কার ও ভাল। নদীর ধারে যেখানে আমাদের তাঁবু পড়ল সেখানটা বেশ বিস্তৃত খোলা জায়গা, সবুজ ঘাস, ক্ষীণ নদীর স্রোত। আমার বড় ভাল লাগল। ঠাণ্ডাও বেশি নয়, আকাশ পরিষ্কার। জিনিষ পত্র খোলা খুলি হল, তাঁবু খাটান হল। যে চার জন তিব্বতী কুলি গারবিয়াং থেকে এসেছে, তাদের হিসেব মিটিয়ে দিলুম কারণ তারা এই পর্য্যন্তই আসবে বলেছিল, এর আগে যাবে না। এখান থেকে নতুন ব্যবস্থা করতে হবে।

৬

রতনসিং বললে দেখি এখান থেকে ঘোড়া, খচ্চর, জব্বু, কি বাহন পাওয়া যায়। রান্না খাওয়া হল, তাঁবুর মধ্যে কম্বল পেতে সকলে বসলুম। রতনসিং চলে গেল জব্বু, খচ্চর, ঘোড়া কি পাওয়া যায় দেখতে। সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে বললে কিছুই পাওয়া গেল না। এক জনের ঘোড়া ছিল, কিন্তু তিব্বতী কোন উচ্চ এক কর্ম্মচারির জন্য এখানকার সব ঘোড়া, খচ্চর আটকান হয়েছে। পরের দিন আমরা এখান থেকে রওয়ানা হতে পারতুম, কিন্তু তা হল না। তবে এখানে আমাদের থাকার অসুবিধা ছিল না।

সকালে নদীর ধারে ঘুরে বেড়ালুম, আকাশ পরিষ্কার, ঠাণ্ডা অবশ্যই ছিল কিন্তু কষ্টকর নয়। সমস্তদিন কোন কাজ নেই রান্না খাওয়া ছাড়া। রতনসিং বেরিয়ে গেছে জব্বু, ঘোড়া বা অন্য বাহন ঠিক করতে। ঐটেই চিন্তার বিষয়। জিনিষ পত্রের জন্য অন্তত দুটি জব্বু বা ঘোড়া বা খচ্চর ও বালকের জন্যও একটি জব্বু বা ঘোড়া দরকার।

রতনসিং যখন এল তার সঙ্গে একজন তিব্বতী। এই তিব্বতী বলিল তার ভেড়া আছে, ভেড়ার উপরই আমাদের সব জিনিষ নিয়ে নেবে যে কটা ভেড়াই তার জন্য লাগুক না কেন। আর বালকের জন্য একটা গাধা আনবে। তাঁবু ও তাঁবুর post সবই ভেড়ার উপর নিয়ে নেবে। এখানকার ভেড়া বেশ বোঝা নিতে পারে। তাই ঠিক হল, পরদিন সকালে রওয়ানা হব। যদিও এখানে একদিন আটকে যেতে চাইনি আটকে যাওয়ায় একদিন বিশ্রামও হল, অসুবিধাও কিছু হল না। রাত্রে পরদিনের জন্য কিছু পুরি করে নেওয়া হল। রাত্রে খুব ঠাণ্ডা, কিন্তু গারবিয়াং থেকে তিনখানা কম্বল এনেছিলুম। একখানা পেতে আমরা সকলে শুই আর অন্য দুখানার এক খানা স্বামীজী ও সত্যসিন্ধু বাবু ও একখানা আমরা দুজনে গায়ে দি। তাতে আর শীত বোধ হয় না। থুলমা খুব গরম। সকালে উঠে আমরা শিগ্র প্রস্তুত হলুম। যে যা পারলুম কিছু খেয়ে নিলুম। ভেড়াওয়ালা গাধা ও ভেড়া নিয়ে এসেছে। তাঁবু খুলে জিনিষপত্র বেঁধে ছেঁদে নিতে সময় লাগল।

তাঁবুর চারটে পোষ্ট দুটো করে এক একটা ভেড়া নিল। পনের ষোলটা ভেড়ার ওপর সব জিনিষ গুলো চাপাল। বেশ ভাল করেই সব গুছিয়ে নিল।

৭

রোদ উঠেছে, আমরা রওয়ানা হলুম। তিব্বত এক বিরাট উপত্যকা। উঁচু নিচু বিস্তৃত মাঠের উপর দিয়ে চলেছি। গাছ পালা নেই বললেই হয়। বাতাস যেমনি ঠাণ্ডা তেমনি জোরে, তবে আকাশ পরিষ্কার থাকলে তেমন ঠাণ্ডা বোধ হয় না। হিমালয়ের চড়াই ওতরাই এখানে নেই। পথে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ দেখলুম। সুড়ঙ্গের মুখে একটা খোঁটায় ছেঁড়া নেকড়া বাঁধা। এর ভিতর এক লামা থাকেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য লামারা নির্জ্জন অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করেন। কেহ কেহ দীর্ঘ কয়েক বৎসর আসন করিয়া ওখানে থাকেন। তাঁদের কিছু খাদ্য বাঁশের ডগায় বেঁধে সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের সাধনার কাল উদযাপন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা বাহিরে আসেন না। শুনেছি এইরূপ একাসনে বহুদিন থাকার পর যখন তাঁহাদের বাহিরে আনা হয় তখন তাঁহারা যে আসনে ছিলেন সেই আসনেই কাহারও কাহারও হাত-পা শক্ত কঠিন হয়ে যায়।

আগেরবার মা ও আমি যেখানে রাত্রে ছিলুম এবার সেদিকে না গিয়ে অন্য পথে চলেছি। বেশ কয়েক মাইল যাবার পর একটা কিছু উঁচু উপত্তকায় এসে পড়লুম। এখানে ভেড়াওয়ালাদের দুচারটে ঘরের মতও আছে। চারিদিকে সবুজ ঘাস। সামনের পাহাড়ে জব্বু, ভেড়া, ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। বেশ মনোরম জায়গা। আজকে আড্ডা এখানেই হল। এখানে দুধ পাওয়া গেল, আশ্চর্য্যের বিষয়। এখানে তাকলা-কোটের চেয়ে ঠাণ্ডা অনেক বেশি।

সকালে কিছু দূর যেতে না যেতেই বরফ এল। স্থানে স্থানে বরফের ওপর দিয়ে চলতে হল। পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছি, নিচে এক নদী। নদীর ধার দিয়েও একটা পথ আছে। কিছু দূর আগে ঐ পথ উঠে এসে আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছি তার সঙ্গে মিশেছে।

সামনে এক বরফের স্তুপ, তার ওপর উঠতে হল। তারপর আবার সমতল জমি। এখন রতনসিং নয়, ভেড়াওয়ালাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কোথায় থাকা হবে সেই জানে। যেখানে এসে দাঁড়াল দেখে মনে হল এটা একটা রাত্রি halt এর জায়গা। এখানে খুব ঠাণ্ডা হবারই কথা, বাতাসও জোর। আমাদের তাঁবু পড়ল। জিনিষ পত্র খুলে গুছিয়ে বসলুম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। রান্নার আয়োজন আরম্ভ হল।

খাওয়ার পর কম্বল জড়িয়ে বসেছি। হ্যারিকেন ল্যাম্প জ্বলছে। সত্যসিন্ধুবাবু বললেন "কাল একাদশী, একাদশীতে মানস সরোবরে ক্রিয়া করতে পারলে খুব ভাল হয়। একাদশী তিথি সকাল সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত আছে।" শুনে আমি বললুম "সে ত খুব ভাল। সময়ের মধ্যেই মানস সরোবর পৌঁছতে হবে।" রতনসিং বললে মানস সরোবর দূর আছে, সেখানে সময়ের মধ্যে পৌঁছতে হলে এখান থেকে রাত একটা নাগাদ বেরোতে হয়। আমি বললুম তাই হবে। স্বামীজীকে বললুম তিনি যদি রাত্রে না যেতে চান ত পরে সকাল হলে আসতে পারেন। স্বামীজী তাই করিবেন বলিলেন। ভেড়াওয়ালাও বলিল যে সে সকাল হলে তাঁবু টাঁবু খুলে নিয়ে আসবে। কেবল গাধা বালকের জন্য আমাদের সঙ্গে যাবে। আবার এই গভীর রাত্রে চলার সংকল্প। মনে একবারও চিন্তা ভাবনা হোল না। শোবার সময় কেবল এই চিন্তা ছিল যে ঠিক সময় ঘুম ভাঙ্গবে তো। ঘুম ঠিক সময় কেন, আগেই ভাঙ্গল। আজ সেদিনকার মত তাঁবু খোলা, বিছানা জিনিষপত্র বাঁধা নেই। মধ্যরাত্রে খোলা আকাশের নিচে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালুম। আকাশ ভরা উজ্জ্বল তারা এক দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রহিল। এখানে পনের হাজার ফিটের উপর উচ্চতা। গুরলা-লা সম্মুখে আকাশের উপর কাল আঁকা বাঁকা রেখা টেনে রেখেছে। ঐ রেখা পার হয়ে আমাদের যেতে হবে। কিন্তু তার জন্য আমার

মনে কোনও চিন্তা নেই। কেবল রওয়ানা হতেই ব্যগ্র। মানস সরোবরে সময়ের মধ্যে পৌঁছতে হবে, কেবল তখন এই ভাবনা। বাইরে চাঁদের আলো। ভেড়াওয়ালা গাধাটাকে নিয়ে এল, বালক তাইতে বসল। রতনসিং গাধাকে ধরে নিয়ে চলল, সঙ্গে সত্যসিন্ধুবাবু আর আমি।

সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য বিষয় যাহা আমাকে এখনও ভাবিলে স্তম্ভিত করে দেয় এগার বছর আঠ মাসের এই বালকের সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা। সমস্তদিন চলায় ঘুম নেই। রাত্রেও মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুম হতে না হতেই আধ রাত্রে উঠে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অতি দুর্গম পথে সজাগ আড়ষ্ঠ হয়ে একটা গাধার উপর বসে, কোথাও বা হেঁটে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে চলা তবু কোন ভয়, বিরক্তি, প্রতিবাদ নেই। একি অসাধ্য সাধন তাহা অন্যে কি করে ধারণা করিতে পারিবে আমি তার সঙ্গে ছিলুম আমিই তা ধারণা করিতে পারি না। এতদিন পরে আজও সে কথা মনে হলে কেবল অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধই যে হয় তা নয়, মনে ভয়, ত্রাস হয়। আর মনে এ প্রশ্নও হয় যে কি অসম্ভব দুঃসাহসীকতা করে তাহাকে নিয়ে গিয়ে ছিলুম। কৈলাশ হয়ে যখন গারবিয়াং ফিরি তখন রতনসিং আমাকে বলেছিল যে সে আগে বলেনি কিন্তু এই বালককে এই বরফের রাজ্যের ভিতর দিয়ে কৈলাশে নিয়ে যেতে তারই সাহস ছিল না। আমারও যে কি করে সাহস হয়েছিল, কি করে একবারও কোন চিন্তা না করে নিয়ে গিয়েছিলুম তা এখন ভাবতেও পারিনা। তবে

নিয়ে গিয়েছিলুম বলেই তার মানসিক বল, দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখেছি যেরূপ কোন বালকের কেন কোন বয়স্ক লোকের মধ্যেও দেখিনি। মনে হয় ব্রাহ্মণের যে মনোবল, একনিষ্ঠ সাধনার কথা পুরাণে, মহাভারতে পড়েছি যে শক্তির বলে তাঁহারা কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইতে পারিতেন, সেই ব্রাহ্মণের শক্তি পুরোমাত্রায় অল্প বয়সেই এই বালকের মধ্যে ছিল। আর ছিল তার বিরাট প্রকৃতির বিরাট মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য বোধ, যে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মুণি ঋষি সাধকেরা বিশাল হিমালয়ের অভ্যন্তরে গিয়া ধ্যান চিন্তায় মগ্ন হইতেন। লিপুর নিচে যেদিন সন্ধ্যায় পাহাড়সম বরফের স্তূপের পাশে আমাদের তাঁবু পড়ে সে তখন উল্লাসের সহিত ঐ বরফের উপর উঠে উঠে পিছলে পিছলে Skating করার মত খেলা করেছিল। কিছু খাবার কথা, বিশ্রাম করার কথা ভাবিনি, বলেনি। এখন তাহার বয়স এগার বছর আট মাস, এর আগে যখন তাহার বয়স আট বছরও হয়নি তখন সে যুমনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার, বদ্রী, চারধাম একটানায় করে। তখন প্রায় সবই পায়ে হাঁটা পথ। আর গঙ্গোত্রী থেকে পায় হাঁটা পথ ধরে বেলক, বুড়োকেদার হয়ে পাঁওয়ালির উপর দিয়ে ত্রিযুগিনারায়ন যায়। পরে আবার একবার একটানায় ঐ চারধাম করে। আরও কত স্থানে কতভাবে ঘুরেছে, আমাকে ভাবতে হয়নি, বিব্রত হতে হয়নি।

আমরা চলেছি একের পিছনে এক, পথ দেখে দেখে, কারণ পথ বলে কিছুই নেই, কেবল বালি, পাথর ও ছোট ছোট গাছ।

তারই ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে চলেছি। কতক্ষণ, কতদূর, চলে এসেছি জানি না। গুরলা-লার মোলায়েম চড়াইর উপর এসে পড়েছি। মনে হচ্ছে যেন পূর্ব্বদিক ফর্সা হচ্ছে। সত্যই ফর্সা হয়ে আসছে। যখন গুরলা-লার প্রায় উপরে এসে গেছি, পূর্ব্বদিকও ফরসা হয়েছে, সত্যসিন্ধুবাবু তখন বললেন যে তাঁর পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, চলতে পারছেন না। ওঁকে বসিয়ে ওঁর হাত পা জোরে ঘসতে লাগলুম। তাতে তাঁর হাত পায়ে সাড় এল। আমাদের সঙ্গে রাত্রে করা পুরি এনেছিলুম, ওঁকে খেতে দিলুম। উনি বললেন—"না, মানস সরোবরে ক্রিয়া করবার আছে, খাব কি করে?" আমি জোর দিয়ে বললুম "না, খান, তাতে কোন দোষ হবে না।" খেয়ে উনি অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন ও চলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আর একটু গিয়েই সেই অপূর্ব্ব স্থান যেখান থেকে চিরস্মরণীয় অপূর্ব্ব কৈলাশের দর্শণ প্রথমে পাওয়া যায়। সকলে সঙ্গে সঙ্গেই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে প্রণাম করলুম। মনে তখন কি ভাব এসেছিল জানি না। যখন মন অভিভূত, বিমোহিত হয় তখন হয়ত কোন ভাবই থাকে না বা ভাবের অনুভূতি থাকে না। উঠে সকলে ঐ বিরাট ছবির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সত্যসিন্ধুবাবুর চোখের কোনে জল, তিনি ভাবপ্রবণ, সহজেই ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন। সামনে বিরাট শুভ্র শিবলিঙ্গ আকাশে মাথা তুলে স্থির হয়ে বিরাজিত, নিচে এক পাশে নীল প্রশান্ত মানস সরোবর, অপর পাশে রাক্ষসতাল। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেবও মাথা তুলে আমাদের মত স্থির দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখছেন।

এখান থেকে নাবাই। আগের বার মা আর আমি ডানদিক দিয়ে নেবে মানস সরোবরের দক্ষিণ তট দিয়ে ঠোকরমণ্ডি গিয়েছিলুম। এবার সম্মুখে পথ ধরে মানস সরোরর ও রাক্ষস-তালের মাঝ দিয়ে চললুম। এই পথই কৈলাশ যাবার পথ। বেশ অনেকটা গিয়ে ডানদিকে ঘুরলুম মানস সরোবর যাব বলে। একটু চড়াই আরম্ভ হল, আমি একটু পেছিয়ে পড়লুম, সকলে বেশ এগিয়ে চলেছে। আমি যেন চলতে পারছিনা। ওঁদের দাঁড়াবার জন্য ডাক দিলুম, কেহ শুনতে পেলে না। আমি আরও পেছিয়ে পড়ছি। পিছনে কেহ আসছে না যে তাকে বলে দেব এগিয়ে ওদের জানাতে। যথাসাধ্য চলতে চলতে ডাকতে লাগলুম। এবার ওরা শুনতে পেল। হাত তুলে দাঁড়াতে বললুম। আস্তে আস্তে নিকটে এলুম। আমি জানতুম একটু কিছু খেলেই এই অবসন্ন ভাবটা চলে যাবে। আগে এরকম দেখেছি। একবার মা আর আমি গিরনার পাহাড়ে ওঠবার সময় এইরকম ভাব হয়েছিল। মাত্র বোধ হয় শখানেক সিঁড়ি উঠে এসেই এইরূপ অবসন্নতা। নিচে থেকে ডুলিওয়ালারা সঙ্গে আসছে ও বলছে ডুলিতে বসতে, অনেক উঠতে হবে, পারবে না। এই বলতে বলতে তারা আমাদের সঙ্গে চলেছে। আমিও বলছি আমরা হেঁটেই উঠব, যদি কোন কারণে আজ না হয় ত আবার কাল আসব, তবু ডুলিতে বসে যাব না। একটা সিঁড়ির ধাপে আমরা বসলুম। মা বললেন কিছু খাও। সঙ্গে মাত্র দুচারটে ওখানকার ছোট ছোট দিশি আঁব ছিল। মা তাই দিলেন, সেই দুটো আঁব খেলুম। খেতে

খেতেই অবসন্ন ভাবটা চলে গেল আর উঠে চলতে আরম্ভ করলুম। এরকম ভাবটা বোধ হয় বায়ুর জন্য হয়, কিছু খেলেই বায়ু প্রশমিত হয় আর স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসে। তাই সত্যসিন্ধুবাবুকে বললুম কিছু খেলে হয়। উনি বললেন "হ্যাঁ, খান।" "কিন্তু আমার যে মানস সরোবরে কাজ করবার আছে।" —"তা হোক্ আপনি এখন একটু কিছু খেলে দোষ হবে না।" আমি বললুম "আচ্ছা তা হলে বালকের অনুমতি নি।" উনি বালককে আমাকে খেতে বলতে বললেন। বালক বলায় আমি একটু পুরি ছিঁড়ে খেলুম। জল নেই, বরফও নেই যে তাই একটু মুখে দেব। যাই হোক্ ঐ সামান্য একটু খেতেই ঐ ভাবটা চলে গেল। আবার আমরা চলতে আরম্ভ করলুম। বেলা হয়েছে, বেশ রোদ। পথ পাহাড়ের গা দিয়ে উঠছিল, এবার নাবাই। সামনে মানস সরোবর। তাহলে এসে গেছি। উল্লাসের সহিত ঢাল পথে নেবে চললুম। পায়ের গতি বেড়ে গেল। মানস সরোবরের ধারে এসে পড়লুম। জলের ধারে বসলুম। পূজা ক্রিয়ার জন্য কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য যা এনেছিলুম খুলে রাখা হল। আমরাও জামাটামা খুলে স্নানের জন্য প্রস্তুত হলুম। জল খুব ঠাণ্ডা, জলে নাবতে ভয় করে, কিন্তু একবার নাবলে আর তত ঠাণ্ডা বোধ হয় না। আমরা অল্প অগ্রসর হয়েই ঘটি করে জল তুলে নাইলুম।

তারপর জলের ধারে তটে বসে ক্রিয়ারম্ভ করলুম। সত্যসিন্ধুবাবু মন্ত্র বলিলেন।

রতনসিং ও আমরা তিনজন পরে যা ছিল খেলুম। কিছু dry fruits কাজুবাদাম কিসমিসাদি পূজার জন্য এনেছিলুম। আর রাত্রে করা যা কিছু ছিল।

মানস সরোবর, কৈলাশ ও গৌরীকুণ্ড, এই তিন স্থানে পূজা তর্পনাদি করিবার আছে, তার মধ্যে এক স্থানে কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায় মনে বড় সন্তোষ বোধ হল।

এখান থেকে এখন মানস সরোবরের পশ্চিম ধার দিয়ে চললুম। চার মাইল গিয়ে গুম্বুল গোমফা। এ গোমফা সরোবরের তট থেকে প্রায় দেড়শ ফুট উচ্চে। মঠের পাশেই একটা ছোট ঘর, তার মধ্যে আর একটা ঘর। আমরা তার মধ্যে ঢুকলুম। এইখানে ভেড়াওয়ালার আসার কথা। দেখি সে একটু আগেই এসেছে। জিনিষপত্র ভেড়া থেকে নাবিয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে যাচ্ছে। স্বামীজীও তাহার সহিত আসবেন, কিন্তু তাঁকে না দেখে জিজ্ঞেস করলুম স্বামীজী (অনন্তানন্দ) কোথায়? সে বলিল "আমার সঙ্গে আসছিলেন, তারপর এক জায়গায় বসলেন, সেখানে আরও দুতিনজন লোক ছিল। স্বামীজী আমাকে বললেন তুমি চল আমি আসছি। আমি চলে এলুম, তিনি এখনি এসে পড়বেন।"

তিনি একা কি করে আসবেন? বড় দুশ্চিন্তায় পড়লুম। বাহিরে বেরিয়ে যে দিক দিয়ে আসার কথা সে দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্ধ্যা হয়ে গেল, অন্ধকার হয়ে এল, স্বামীজী

এলেন না। কি করি ? রতনসিংকে জিজ্ঞেস করলুম। সে বললে তিনি হয়ত আসছেন, এসে পড়বেন। কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, অন্ধকার হল, আর কখন আসবেন। ভেড়াওয়ালাকে ডেকে বললুম "তুমি এগিয়ে দেখ, উনি কোথায় আটকে গেলেন, এরজন্য তোমাকে টাকা দেব।" সে বললে তাহার ক্ষাণিকটা গিয়ে দেখা নিরর্থক, কারণ উনি এখানে না এসে আর এক পথ ধরে সঙ্গীদের সঙ্গে ডারচেনের দিকে গিয়ে থাকতে পারেন। সে আরও বললে যে স্বামীজী ঠিকই যাবেন। অবশ্য আমি জানতুম তিনি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নন। বরমা ও সান (Shan) দেশে ঘুরেছেন, নিজেকে চালিয়ে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে। ওঁর কাছে টাকাও আছে, কারণ প্রথমেই আমি সব টাকা নিজের কাছে না রেখে ওঁর কাছে, সত্যসিন্ধুবাবুর কাছে ও আমার কাছে ভাগাভাগি করে রেখেছিলুম। তবে এ পথে ত কিছু পাওয়া যায় না। টাকা সঙ্গে থাকলেই বা কি হবে। উনি কি খাবেন। রাত্রে কি পেতে, কি গায়ে দিয়ে শোবেন, নিরুপায় হয়ে তাই ভাবতে লাগলুম। গারবিয়াংয়ে কম্বল নেওয়া ছাড়া আমাদের চার জনের জন্য গরম জামা কাপড় নিয়েছিলুম এবং পথে তিব্বতীদের বোনা মোটা উলের মোজা ও হাতের দস্তানা সকলের জন্য নিয়েছিলুম। ওঁর গায়ে গরম কাপড় চোপড় থাকলেও রাত্রে শোবার কি হবে ? বড়ই দুশ্চিন্তা হল, কিন্তু কি করব। ভেড়াওয়ালা জোর দিয়ে বললে, স্বামীজীর সঙ্গে আরও দুতিন জন আছে, উনি তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নেবেন।

ঘরে এসে ঢুকলুম। উনুন ধরান হয়েছে, ধোঁয়ায় ঘর ভরতি। দেয়ালের উপর ধোঁয়া বেরোবার একটা ছোট জানলার মত ছিল, কিন্তু তা বন্ধ। তাড়াতাড়ি খুলে দিতে বললুম। কিন্তু তবুও যেন শ্বাসরোধের উপক্রম। তাড়াতাড়ি বাহিরের খোলা ঘরে বালককে নিয়ে গিয়ে বসলুম। সত্যসিন্ধু বাবুকেও বেরিয়ে আসতে বলুলম।

এখানে তেমন ঠাণ্ডা নেই, আর ছোট ঘর, তাও ঘরের ভিতর ঘর। কিন্তু এরকম বন্ধ ছোট স্থানে গাদাগাদি করে শুতে আমার অস্বস্থি হয়।

রাত কাটল, আমরা বেরিয়ে পড়লুম। বারখা (বা পারখা) নয় মাইল, আজ ঐ পর্য্যন্ত যাওয়া। পথ প্রায় সমতল, তবে চারিধারেই বরফ, আর অতি তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস। শরীর ভিতর পর্য্যন্ত কেঁপে উঠছে। সেই তীব্র বাতাসের বিরুদ্ধে চলতে হচ্ছে। যেন শ্বাস বন্ধ হয়। সাত আট মাইল এইভাবে চলার পর খানিকটা বেশ চড়াই। পাশে অল্প দূরে গঙ্গা-ছু। গঙ্গা-ছু ছোট এক স্রোতস্বিনি যাহা মানস সরোবরের জল রাক্ষস তালে নিয়ে যায়। এই রকম শুনলুম যে যখন এই দুই সরোবরের যোগাযোগ ছিল না তখন রাক্ষসতালের জলকে অপবিত্র মনে করা হত এবং তার জল লোকে খেত না। পরে যখন এই গঙ্গাছুর দ্বারা যোগ হল তখন রাক্ষস তালের জল পবিত্র হল। এখান থেকে অনতিদূরে শেরখা খিরোতে স্বর্ণখনি আছে, আগে খনন করা হত এখন কিছু বছর ধরেই বন্ধ।

বারখা বিস্তৃত মাঠের মধ্যে। গারতোক থেকে লাসার পথ এই বারখা হইয়া গিয়াছে। এখানে খান দুয়েক ঘর ও ভেড়াওয়ালাদের কতকগুলি তাঁবু রয়েছে। যাত্রীদের ব্যবহারের যে ঘর তাইতে উঠলুম। ছোটই ঘর, দরজায়ে পাল্লা নেই। বাতাস বড় জোর সেজন্য ঠাণ্ডাও বেশি। পাশেই একটা সরু জলধারা, জল ঘোলা, পরিস্কার নয়। আমি সেখানে গিয়ে বসলুম সন্ধ্যাহ্নিক করতে। এখানে ঠাণ্ডা বেশি, দরজাও খোলা, কিন্তু তবুও গুসল গোম্ফার ঘরের চেয়ে ভাল।

স্বামীজীর জন্য চিন্তিত, তবে তিনি যদি ডারচেনের দিকে গিয়ে থাকেন, আর নিশ্চয়ই তাই করেছেন, তাহলে বারখা তাঁর পথে পড়বেনা, কাজেই এখানে তাঁর আসার সম্ভাবনা নেই। এখান থেকে ডারচেন প্রায় আট মাইল।

সকালে চলবার সময় ফিরে ফিরে দেখছি স্বামীজী আসছেন কিনা।

ডারচেনের দিকে চলেছি। ডারচেন কৈলাশের পাদদেশে। এইখান থেকে কৈলাশের প্রদক্ষিণ আরম্ভ হয়, প্রায় ৩২ মাইলের।

রোদ উঠেছে, মাঠের উপর দিয়ে চলেছি। সামনে কৈলাশের উপর রোদ পড়েছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। বার বার চেয়ে দেখি, আবার দেখি। কালকের মত আজ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না। চলতে বেশ ভাল লাগছে। সামনে ডারচেন, উপরে কৈলাশের

দিকে চেয়ে ভাবছি তুষরাবৃত শিখরে বসিয়া, কাল উপেক্ষা করিয়া শিব কি ভাবেন, কিসের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাঁর প্রশান্ত নির্বিকার ধ্যানস্থ মূর্ত্তিই আমার ভাল লাগে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক গল্প কাহিনী আছে কিন্তু সেই সব কাহিনীর শিব আর আমি কৈলাশ শিখরে উপবিষ্ট যে শিবের কথা ভাবছি এক নয়। ঐসব কাহিনীতে শিব আমাদেরই মত এক মানুষ, মানুষের ভাব, প্রকৃতি, বিকার পূর্ণ। ঐ শিবই আমাকে প্রভাবিত করেন যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চেয়ে চিন্তায় মগ্ন। এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাণ্ড জোড়া রহস্য, তার কারণ, অর্থ, উদ্দেশ্য, কে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই সৃষ্টি কর্ত্তারই বা কে সৃষ্টিকর্ত্তা—এইসব বিরাট রহস্য জানিবার জন্যই কি শিব ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন ? তাই আমি ভাবি। তবে এ ঘোর রহস্য বোধ হয় ভেদ করা সম্ভব নহে, তাই হয়ত শিবের ধ্যান ভঙ্গ হয় না। চিরকালই তিনি যোগাসনে বসিয়া আছেন।

ডারচেন পৌঁছলুম। এখানে কয়েকটা তাঁবু রয়েছে, লোকও রয়েছে। একটি তাঁবুতে আমাদের থাকবার হল, আমাদের তাঁবু খুলতে হল না। এখানে এসে আমি বললুম স্বামীজী না আসা পর্যন্ত এইখানে থাকব। তাঁবুর বাইরে গিয়ে দেখতে লাগলুম। খানিকক্ষন পর খুব দূরে দুজনকে আসতে দেখা গেল। উদ্‌গ্রীব হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাঁহারা আর একটু নিকটে আসতে বোধ হল একজনের চলা যেন স্বামীজীর মত আর তাঁহার মাথায় লাল

গেরুয়া রংয়ের পাগড়ি। নিশ্চয় স্বামীজী, আমি ডেকে সকলকে বললুম। স্বামীজী আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেন। আমরা ব্যস্ত হয়ে তাঁহার আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি আসতেই বললুম "স্বামীজী ভেড়াওয়ালার সঙ্গে আপনার কি করে ছাড়া-ছাড়ি হল? কোথায় কি করে দুরাত্রি কাটালেন? কিছু খাওয়াও বোধ হয় হয়নি?"

উনি বলিলেন "না, আমার তেমন কোন কষ্ট হয়নি। পথে তিনজনের সঙ্গ পেয়ে তাদের সঙ্গেই চলি, তাদের সঙ্গেই খাওয়া, শোয়া হয়েছে। কেবল এই চিন্তা ছিল আপনারা এগিয়ে না যান।"

আমি বললুম "আপনি না এলে এগিয়ে যাব, একি হতে পারে। আমি গুম্বলেই আপনার অপেক্ষা করতুম, কিন্তু ভেড়াওয়ালা বললে যে আপনি ওদিকে না গিয়ে সোজা পথে ডারচেন আসবেন। সেইজন্য আমি এখানে এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করব বলে এসেছি। অল্প একটু আগেই আমরা এসেছি।"

দুঃশ্চিন্তা দূর হল, আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে রান্না খাওয়া করলুম। বাহিরে ঘুরে ফিরেও দেখলুম। একটা পথ সোজা কৈলাশে উঠে গেছে। পরিক্রমার পথ যে পথ ধরিয়া আমরা যাব সেটা বাঁদিক দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। সামনে সোজা সরু যে পথ কৈলাশের দিকে উঠে গেছে সেই পথে মাইল

চারেক দূরে আসল গৌরিকুণ্ড। স্বামী প্রণবানন্দ তাই লিখেছেন। এ অঞ্চলের বিষয় তাঁর চেয়ে বড় authority নেই। কৈলাশের পিছনে যে কুণ্ড তাহাকেই তবে এখন সকলে গৌরিকুণ্ড বলে।

৮

ডারচেন থেকে মাইল চারেক গিয়ে Changjagang, ছাঙ্গ জাগাঙ্গ। যাঁহারা সাষ্টাঙ্গে শুইয়া ডণ্ডি খাটিয়া কৈলাশ প্রদক্ষিণ করেন তাঁহারা এইখান হইতে আরম্ভ করেন।

উঁচু নিচু পথের ওপর দিয়ে চলেছি, ডান পাশে কৈলাশ, বাঁধারে নিচে এক নদী, তার ওপারে পাহাড়, অতি মনোরম। আমরা সোজা উত্তরে চলেছি। ছাঙ্গজাগাঙ্গের পর পথ নেবে গেল সেরসাঙ্গে (Sershung)। এ জায়গাটা বেশ। নদীর বিস্তৃত তটের উপর। এখানে এক উচ্চ (flag staff) ঝণ্ডার পোষ্ট পোতা রয়েছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মোৎসবে এখানে মেলা হয় ও সেই সময় নতুন পতাকা লাগান হয়। ডান দিকে কৈলাশ পর্ব্বৎ যেন সোজা আকাশে উঠে গেছে। উপরে শিখরের কাছাকাছি একটা খোলা দরজার মত দেখা যাচ্ছিল। রতনসিং বললে ওর ভিতর নাকি এক গুহা আছে, কিন্তু কেহ যেতে পারে না। কেহ কেহ চেষ্টাও করেছিল। রতনসিং আরও বললে যে নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে এক সাধক যোগীপুরুষের পদচিহ্ন আছে।

আমরা এইখানে নদীর ধারে বসে কিছু খেয়ে নিলুম, তারপর আবার চললুম। একজন তিব্বতীকে দেখলুম সাষ্টাঙ্গে দণ্ডি খেটে পরিক্রমা করছে। আর একটু এগিয়ে দেখি একজন নিজের অন্ধ মাকে নিয়ে চলেছে। কখন মাকে পিঠের উপর নিয়ে কখন মাকে সযত্নে হাত ধরে ধীরে ধীরে চলেছে পরিক্রমা দিতে। ধন্য তার মার উপর ভালবাসা। দাঁড়িয়ে বললুম "তোমারই পরিক্রমা সার্থক।" এইরূপ এক জনের পিতৃভক্তি দেখেছিলুম। একদিন সন্ধ্যাবেলা কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে বসে আছি। দেখলুম এক বৃদ্ধকে একজন কাঁধের উপর বসিয়ে নিয়ে এল ও পার্কের মধ্যে যেখানে পাইখানা সেদিকটা গেল। সঙ্গে আর কয়েকজন। জিজ্ঞাসা করে জানলুম বৃদ্ধটী চলতে, হাঁটতে পারেন না; তাঁর ছেলে পিতাকে তীর্থ দর্শনে নিয়ে যাচ্ছেন। এখান থেকে জগন্নাথ ও অন্যান্য তীর্থে নিয়ে যাবেন। পিতা চলতে পারেন না বলে পুত্র কয়েকজন লোক এনেছেন পিতাকে পারি করে কাঁধে বহন করিবার জন্য। ইঁহারা বিহারের লোক। পিতার প্রতি এরকম ভক্তি ভালবাসা দেখিওনি, শুনিওনি। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনে গিয়েছিলেন সেইজন্য তাঁহার কত প্রশংসা, কিন্তু আমার মনে হল এই অজ্ঞাতনামা পুত্রের পিতৃভক্তি আরও প্রশংসনীয়। আমি সকালে দেখতে গিয়েছিলুম তাঁহারা কোথায় রাত্রে ছিলেন। গিয়ে দেখি Lansdowne Road য়ে ফুটের উপরেই তাঁহারা ছিলেন। আর্থিক অবস্থা

তাহলে সচ্ছল বলা যায় না, তাছাড়া পুত্রের নিজেরও পরিবার পুত্রাদি আছে। কয়েকজন লোককে মজুরি দিয়ে পিতাকে তাদের কাঁধে বহন করিয়ে মাঠে ও পথের ধারে দিন রাত কাটিয়ে স্থানে স্থানে দূর তীর্থে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে পিতৃভক্তির যে এক গভীর মহিমা ছিল তাহা আমাকে অভিভূত করে। কে না বলে যে আমিও পিতা-মাতাকে তীর্থ দর্শন করাতুম কিন্তু অবস্থা নেই। পরিবার ছেলে মেয়েদের খরচই কুলায় না। আর পিতা অপটু, চলতে দাঁড়াতেও পারেন না, তাঁকে নিয়েই বা যাব কি করে? কিন্তু এই পিতৃভক্ত পুরুষ ত নিয়ে গিয়েছেন। স্ব-ইচ্ছায় শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা যত্নের সহিত নিয়ে গিয়েছেন। তাঁহারও পরিবার ছেলে মেয়ে ছিল, অবস্থাও যাঁহারা অর্থাভাবের অজুহাত দেখান তাঁদের চেয়ে ভাল ছিল না বরং খুব সম্ভব বেশি সংকীর্ণই ছিল। তবে এঁর মধ্যে যে জিনিষ ছিল ও যাহার প্রেরনায় ও বলে তিনি পিতাকে তীর্থ ধর্ম্ম করাইতে বাড়ী ও বাড়ীর সকলকে ছেড়ে বেরিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে ইঁহার অগাধ একনিষ্ট পিতৃপ্রেম ও শ্রদ্ধা ভক্তি। যাঁহারা পিতামাতাকে তীর্থ দর্শনে নিয়ে যান না, বরং নিজেরা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যান, তাঁদের মুখে না নিয়ে যাবার অনেক মিথ্যা অজুহাত থাকিলেও মনে এই পিতৃভক্তের মত তাঁদের পিতৃ-ভক্তি নাই। যদি কোন বাল্মিকি এই পিতৃ ভক্তের কাহিনী লিখিতেন তাহলে সেটা রামায়ণের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও মর্ম্মস্পর্ষি হইত।

সেরসুঙ্গ থেকে পথ উঠে চলেছে। উপরে নন্দি বা

চুখু গোম্ফা। পরিক্রমার পথে এই প্রথম গোম্ফা বা মঠ। আমরা উঠেই চলেছি। একটা নদীর (লা চু) পুল এল, ওপারে একটু দূরেই দিরফুক গোম্ফা (Dirphuk)। এইটে দ্বিতীয় গোম্ফা। এই লা চু নদীর ধারে ধারে গেলে সিন্ধু নদীর (Indus) উৎপত্তি (source) স্থানে যাওয়া যায়।

আমরা পুল পার হয়ে গোম্ফার দিকে গেলুম না। ভেড়া-ওয়ালার কজন নিজের লোকের সঙ্গে দেখা হল, তারা উপরে (Dolma La) দলমা লায়ে উঠে যাচ্ছে, ঐখানে থাকবে। তাদের সঙ্গে আমাদের এও থাকতে চায়। দিরফুক গোম্ফাতেই আমাদের কিন্তু থাকা ভাল ছিল। ঐখানেই যাত্রীরা থাকে। আমাদেরও সেখানে থাকবার কথা। দলমা লা ১৮৬০০ ফিট উঁচু। সেখানে গিয়ে যে আমাদের খোলা আকাশের তলায় রাত্রে থাকতে হবে তা বুঝিনি, ভেড়াওয়ালার কথায় উঠে চললুম। খাড়া চড়াই, পাথরের উপর দিয়ে পথ। যখন দলমা লাতে উঠে এলুম তখন বেলা পড়ে গেছে। স্থানটি কিন্তু বড় চমৎকার, ঠিক কৈলাশের পিছনে, উত্তর দিকে। চারিদিকের দৃশ্য অবর্ণনীয়। ঠাণ্ডাও ভীষন। আমাদের তাঁবু পড়ল। ভেড়াওয়ালাকে তাঁবুর ভিতর আসতে বললুম, সে এল না। তার সঙ্গীদের সঙ্গে সে বাহিরেই থাকিবে। এরা ঠাণ্ডায় ও খোলা মাঠে শুতে এমনই অভ্যস্ত যে তাতে ওদের যেন কোন কষ্টই হয় না।

এত উচ্চে, ১৮৬০০ ফিট, বোধ হয় তার চেয়ে বেশি, কিন্তু আমাদের শ্বাসে কোন কষ্ট বোধ হয় নি। তার কারন আমরা

ধীরে ধীরে নিচে থেকে উঠে এসেছি। এভারেষ্ট অভিযানে প্রথম প্রথম অভিযাত্রীয়া তাড়া তাড়ি উঠিবার চেষ্টা করায় এত উচ্চতার বেশ কিছু নিচে থেকেই তাহাদের oxygen অকসিজিন ব্যাবহার করিতে হয়েছিল। পরে তাহারা দেখেছিল যে ধীরে ধীরে acclamatised হতে হতে উঠলে বিনা অক্সিজিনে অনেক উঁচু যাওয়া যায়। আমরা সেইরূপ acclamatised হতে হতে এসেছি সেইজন্য এই উচ্চতায় আমাদের অস্বস্থি বোধ হয়নি কেবল রাত্রে একবার বালক অস্বস্থি বোধ কোরে উঠে বসে। আমি উদবিগ্ন হয়ে উঠে পড়লুম। একটু গরম জল খেতে দিলে ভাল হবে ভেবে তাড়াতাড়ি মোমবাতি জ্বেলে স্বামীজী ও আমি একটা বাটিতে গরম জল করে একটু গুড় ও গরম জল খেতে দিলুম। গভীর উদবিগ্ন চিত্তে মনে মনে মাকে স্মরণ করলুম। সে একটু গুড় ও গরম জল খেল ও আবার শুল। হয়ত উচ্চতার জন্য নয় তাহার একটু কোষ্ট বদ্ধ ধাত ছিল সে কারণে হয়ত পেট পরিস্কার নেই তাই উর্দ্ধ বায়ু হইয়া থাকিবে। দিন রাত জুতো মোজা গরম জামা কাপড় পরে থাকাতেও বায়ু কুপিত হয়। কি জানি কি কারণে তার ঐ অস্বস্থি ভাব হয়, কিন্তু এত শীঘ্র ও সহজে তার উপসম হইবে ভাবতেও পারি নি। কি করে হল জানি না, কেবল মা-ই জানেন।

সকালে বাহিরে এসে দাঁড়ালুম। সামনে সমস্ত বরফাচ্ছন্ন। কৈলাশের গায়েই আমরা ছিলুম। আকাশ, পাহাড়, পাথর,

আর বরফ, তার উপর বিরাজিত গভীর নিস্তব্ধতা। কি বিরাট অপরূপ স্থান। তার মাঝে আমাদের এই কয়জন ক্ষুদ্র প্রাণির নড়াচড়া নিশ্চয় কতই না অর্থহীন দেখিয়ে ছিল। ঐ বরফের উপর দিয়ে আমরা চললুম। প্রথম একটু নিচে নেবে তারপর খানিকটা কড়া চড়াই। চারিদিকে বরফ, বরফের ওপরই চলা। ভেড়াওয়ালা এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে গাধার উপর বালককে বসিয়ে রতনসিং গাধার লাগাম ধরে চলেছে, আমি সকলের পিছনে। ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে গাধার পিঠে বসে বালক আবার অস্বস্থি বোধ করছে, রতনসিং আমাকে ডেকে বলল। আমি উদ্‌বিগ্ন হয়ে এগিয়ে চললুম। বরফের উপর পা যেন চলে না। যথাসাধ্য জোরে গিয়ে ভীত হয়ে রতন-সিংকে বললুম কি করবে। মনে মনে মাকে চিন্তা করলুম। রতনসিং ও ভেড়াওয়ালা বল্‌লে "আমরা পালা করে ওকে পিঠে করে নিয়ে যাব। তাতে ওর শরীর গরম হবে।" ঠিক কথা ওদের পিঠের উপর চেপে থাকলে ওদের শরীরের চাপে ও গরমে ওর শরীর গরম হবে, শরীরে সাড় আসবে। আমি অত্যন্ত ভীত উদ্‌বিগ্ন হয়ে মাকেই স্মরণ করছিলুম, যেন তাঁকে সামনে দেখতে পাচ্ছিলুম। ওরা দুজনে পালা করে বালককে পিঠে নিয়ে চল্‌ল। চড়াইর পর একটু সমতল স্থান। এখানে বালককে নাবাইল। বালকের সে ভাব চলে গেছে। কি করে, কি ভাবে গেছে জানি না। তার হাত ধরে আস্তে আস্তে চললুম। ঠিক কৈলাশের পিছনে। কৈলাশ শিখর এখান থেকে মাত্র

চার হাজার ফুটেরও কম উচ্চে। এইখানে রতনসিং দেখাল একটা বেশ বড় বসবার মত (stone slab) পাথর পাহাড়ের গায়ে লাগান রয়েছে। এই পাথরের উপর বসে গোরী শিবের আরাধনা করেছিলেন। দাঁড়িয়ে দেখলুম। সামনে উপরদিকে কৈলাশ শিখরের দিকে চেয়ে রইলুম। এর চেয়ে ভাল আরাধনার জায়গা কি হতে পারে? এইখানে বসে আরাধনা করেই তিনি শিবকে পেয়েছিলেন কিন্তু বসে আরাধনা করিলেই আরাধ্য বস্তু পাওয়া যায় না। কোন ক্রিয়া বা কোন উপাদান সামগ্রী অর্পণেও সফলতা আসে না। আরাধ্য এবং আরাধকের মধ্যে তাহাতে মিল হয়না। মাঝে থেকে যায় ব্যবধান। সত্যকার মিল, সত্যকার পাওয়া তখনি হয় যখন উভয়ের ভাব, চিন্তা, অনুভব, মিশে যায়, দুইকে এক করে দেয়, দুইয়ের মধ্যে ভেদাভেদ সরিয়ে দেয়। ইহাই সত্যকার মিলন যে মিলন পতি পত্নির মিলনের উচ্চতম আদর্শস্বরূপ কল্পনা করা হয়।

সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হল পার্ব্বতী যখন কৈলাশের দিকে মুখ করিয়া আরাধনায় বসিয়া ছিলেন তখন হয়ত আমরা পাওয়া অর্থে যেরুপ বুঝি সেভাবে শিবকে পাওয়া তাঁহার মনে ছিল না। এস্থলে বসিলে কিছু নেবার পাবার আকাঙ্ক্ষা যেন চলে যায়। তিনি তখন নিশ্চয়ই শিবের মতই যোগাসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিবেন। যখন তাঁহার ধ্যান শিবের ধ্যানের সহিত মিলিত হয় তখনি তিনি শিবকে দেখিতে পান, তখনি উভয় একআত্মা হইয়া যান।

নচেৎ কি করিয়া দুইজনে সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংসের তাণ্ডব লীলায় স্থির অবিচলিত হইয়া, কাল জয় করিয়া বসিয়া আছেন। যেন একমনে, এক দৃষ্টিতে সৃষ্টির বিরাট রহস্যের ভিতর কিসের সন্ধান করিতেছেন। এইরূপ একাগ্র, একনিষ্ঠ আরাধনায় পার্ব্বতী শিবকে পৃথক ভাবে পান নাই, শিবের সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ আরাধনার স্থান এই স্থানের অপেক্ষা ভাল আর কোথায় হইতে পারিত ? আর তাঁহার যোগাসনের আসনই বা এই শিলার অপেক্ষা ভাল আর কি হইতে পারিত ?

এখান থেকে একটু নেবে গিয়েই গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ড বরফে আচ্ছাদিত, চারিধারেও বরফ। এখানে আমার ক্রিয়া করিবার কথা, কিন্তু দেখলুম সম্ভব নহে। ক্রিয়া করিতে সময় লাগবে, বরফের উপর বসে এই ঠাণ্ডায় তা সম্ভব নয়। আকাশও পরিষ্কার নয়, কুয়াষাচ্ছন্ন। সত্যসিন্ধুবাবুকে বললুম নিচে রাক্ষস তালের ধারে বসে করব। ওদের বললুম বালককে আবার পিঠে নিতে কিন্তু একটু ওদের পিঠের উপর থাকার পরই সে নিচে নাবতে চাহিল ও রতনসিং এর সঙ্গে হেঁটে চল্‌ল। এখান থেকে ক্রমান্বয় নাবাই। বালক এমন বেগে রতনসিংয়ের সঙ্গে চল্‌ল যে আমার তার সঙ্গে চলা মুস্কিল হয়ে পড়ল। কি আশ্চর্য, কি রহস্য। এই অল্প আগে যে আমার মনে কি তীব্র ভয় ও উদ্বেগ এনেছিল সে এখন স্ফুর্তির সহিত আমার চেয়ে জোরে হেঁটে চলেছে। কি করে এরকম হল জানি না। অজানার রহস্য অজানারই জানা। সেদিনকার কথা মনে হলে আজও কি একটা গভীরভাবে মন অভিভূত হয়।

নিরুদ্বেগে আমি যথাসাধ্য বালকের পিছন পিছন চলতে লাগলুম। ক্রমান্বয় নেবে চলা কিন্তু যেন একটা দুর্ভেদ্য বরফের রাজ্যের ভিতর দিয়ে। নাবতে নাবতে এক নদীর ধারে এসে পড়লুম। এবার নদীর ধার দিয়ে পথ, সমতল জায়গা। বরফ নেই, ঘাসের উপর দিয়ে চলা। এখানে কিছু ভেড়াও চরছে ও তার সঙ্গে দুচার জন লোকও রয়েছে। এবার পরিক্রমার পথে তৃতীয় গোম্ফা এল, Zunsulphuk Gompa ঝুনসুলফুক গোম্ফা। এখানেই আজ থাকা। মঠের ভিতরই জায়গা হল। এখানে সেরকম ঠাণ্ডা নেই। বেশ স্বাচ্ছন্দে রান্না খাওয়া শোওয়া হল।

পরিক্রমা এইখানেই শেষ বলা যায়, কারণ ডারচেন যেখান থেকে পরিক্রমা আরম্ভ এখান থেকে মাইল ছয়েক মাত্র। কৈলাশ প্রদক্ষিণ হয়েছে, মনে বড় আনন্দ, সন্তোষ।

সকালে আমরা একটা জলধারা পার হয়ে ডারচেন ডাইনে আর বারখা বাঁয়ে রেখে চললুম। রোদ উঠেছে। সমান মাঠের উপর দিয়ে চলা, তবে জল নেই। সামনে দেখলুম বেশ এক বড় তিব্বতীয় দল আসছে। তাদের সঙ্গে ভেড়া, জব্বু, ঘোড়াও আছে। এগিয়ে আরও ছোটখাট দল আসছে দেখলুম। ভেড়াওয়ালা দাঁড়িয়ে তার পরিচিত কয়েক জনের সহিত কথা কহিল। রতনসিংও কথা বলিল। তারপর তাহারা ঠিক করিল যে আরও খানিকটা গিয়ে আমরা আজ রাত্রে থাকব। ওদের কাছে ওরা শুনেছে যে সেখানে গাছপালা আছে,

কাঠ পাওয়া যাবে। আমরা এগিয়ে চললুম। দূরে গাছ দেখতে পেলুম। গিয়ে দেখি গাছ অনেক রয়েছে, ডালপালাও ভাঙ্গা পড়ে রয়েছে, তবে জল কোথাও নেই।

তাঁবু ফেলা হল, জিনিষপত্র খোলা হল। তার পর একটা থলে নিয়ে ভেড়াওয়ালা গেল বরফ আনতে। জল নেই, বরফের স্তুপ স্থানে স্থানে আছে। থলে ভরে বরফ এনে ফেল্‌ল। রতনসিংও কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে এল। আগুন জ্বেলে বরফ গলিয়ে জল করা হল। কোন অসুবিধা হল না। বরফের স্তুপ এখানে সেখানে থাকিলেও তেমন ঠাণ্ডা বোধ হলনা, তার কারণ আমরা যে দারুণ ঠাণ্ডা থেকে এসেছি তার তুলনায় এখানকার ঠাণ্ডা কিছুই নয়। আমরা বেশ খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত মনে হাতা পা ছড়িয়ে শুলুম।

সকালে রাক্ষস তালের দিকে চললুম। স্বামীজীর মানস সরোবরে স্নান হয়নি, উনি রাক্ষসতালের ধার দিয়ে ডারচেন গিয়েছিলেন। এখান থেকে মানস সরোবর দূর নয়। উনি গঙ্গাছুর পাস দিয়ে মানস সরোবর গেলেন। রাক্ষসতালে আমাদের কাজ করিতে সময় লাগবে। উনি ইতিমধ্যে স্নান করিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিবেন।

এখন আর চড়াই উৎরাই নেই, উঁচু নিচু পথ এঁকে বেঁকে চলেছে। রাক্ষসতালের ধারে এসে পড়লুম। সত্যসিন্ধুবাবুকে বললুম "এইখানেই আসুন পুজা-ক্রিয়াদি করি।" জলের ধারে বসলুম। কৈলাশে ও গৌরীকুণ্ডে, দু জায়গায় ক্রিয়া করিব স্থির ছিল, সেখানে হয়নি সেজন্য এখানে দুইবার করিব।

একের পর এক দুইবার ক্রিয়া সম্পন্ন হল।

এই মহাতীর্থে নানা দুর্যোগ, বিপদ, অসুবিধা সত্ত্বেও যে কার্য্য সুসম্পন্ন হল তাতে আমার মন কেবল তৃপ্ত নয়, গভীর ভাবে অভিভূত হয়। কি করে মনে এই দৃঢ়তা এসে ছিল যে যেভাবেই হোক এখানে আসবোই, মধ্যরাত্রে বরফের উপর চলতে হবে, তাই চলবো, তবু যাবো, জানি না। এখনও ভাবি কি করে, কোথা থেকে সে বল এসেছিল। তবে জীবনের কোন ঘটনাই কেন, কি করে আসে যায় জানি না, বুঝি না, এবং সেই ঘটনার ভিতর দিয়ে কি ভাবে যাই তাও জানি না। এই দুয়ের উপরই যেন আমার হাত নেই। সে সময় বোধ হয় এই কথাই মনে হয়ে ছিল। কৈলাশের দিকে নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে দেখি, কিন্তু তিনিও আমার দিকে চেয়ে, আমারই মত নির্ব্বাক।

উঠে দাঁড়ালুম। স্বামীজী এসে গেছেন। কাজু কিসমিস প্রসাদ সকলে একটু একটু নিলুম। রতনসিং আর ভেড়াওয়ালাকে দিলুম। তারপর কৈলাশকে প্রণাম করে চললুম।

লঘু পদক্ষেপ, মন তৃপ্ত, হাল্কা। রাক্ষস তাল পার হয়ে গুরলা-লার চড়াই আরম্ভ হলো। ভেড়াওয়ালা এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে রতনসিং বালককে গাধায় বসিয়ে নিয়ে চলেছে। আমি যথা সাধ্য শীঘ্র চলছি তবুও চড়াইতে পেছিয়ে পড়ছি। বাতাস উল্টোদিক থেকে, তার এত বেগ যে যেন শ্বাসরোধ হয়।

স্বামীজী ও সত্যসিন্ধুবাবু পিছনে আসছেন। ভেড়াওয়ালা ও রতনসিংকে দৃষ্টির মধ্যে রাখতে হচ্ছে কারণ এখানে বিস্তৃত মাঠে কোন চিহ্নিত পদরেখাও নেই যা ধরে যাব। কেবল উহাদের অনুসরণ করেই যেতে হচ্ছে। উঁচু নিচু মাঠ। যখন উহারা নিচে নেবে যাচ্ছে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। প্রায় ছুটে চলে আবার তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে আনতে হচ্ছে। রতনসিংকে ডাক দিয়ে আস্তে চলতে বলি কিন্তু সে শুনতে পায় না, বেগে চলে। তাদের দৃষ্টিতে রেখে অনুসরণ করা ছাড়া উপায় নেই।

স্বামীজী ও সত্যসিন্ধুবাবু পিছনে পিছনে ঠিকই আসছেন জানি। রতনসিংকে যত জোরে পারলুম ডেকে দাঁড়াতে বললুম, সে তবুও শুনতে পেল না। বেলা পড়ে এসেছে, রতনসিংরা দূরে ঢালু ভূমিতে নেবে গেছে, দেখতে পাচ্ছি না। আরও জোরে চললুম। যেখান থেকে ঢালু আরম্ভ সেখানে পৌঁছে দেখি খানিকটা নিচে গিয়ে তারা দাঁড়িয়েছে ও ভেড়ার উপর থেকে জিনিষপত্র খুলে নাবাচ্ছে। তখন ধীরে ধীরে নেবে তাদের কাছে পৌঁছে একটা পাথরের উপর বসে পিছন দিকে স্বামীজীদের আসার অপেক্ষায় চেয়ে রইলুম।

সন্ধ্যা হয়ে এল। স্বামীজীদের কিন্তু দেখা নেই। চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ওরা বললে আসবেন। এখানে আরও কয়েকজন ছিল, তাদের বললুম টাকা দেব কেউ তাঁদের খোজে

যাও। তাতে তারা বললে "কোথায় যাব, ওঁরা কোনদিক দিয়ে আসছেন জানিনা।" তাদের কথা ঠিক কারণ মাঠের উপর দিয়ে আসা, কোন চিহ্নিত পথ নেই। আমরা যেদিক ধরে এসেছি সেদিক থেকে একটু সরে গিয়ে থাকলেই কোথায় চলে গেছেন তা জানা অসম্ভব। তারা অনেক বললে চিন্তা নেই, তাঁরা ঠিক আসবেন। রাত্রে না এসে পড়লেও সকালে আসবেন। কিন্তু চিন্তা যায় না। দুশ্চিন্তায় রাত কাটলো। সকালে ওদের বললুম ওঁদের জন্য এখানে অপেক্ষা করবো কিন্তু ওরা বললে এখানে থাকা বৃথা কারণ ওঁরা যখন কাল আসেননি তখন আজ তাঁরা নিচে নদীর ধার দিয়ে তাকালাকোট যাবেন। সেইখানেই আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

রওয়ানা হলুম। নিচে নদীর ধার দিয়ে কয়েকজনকে যেতে দেখা গেল। ওরা বললে ওদের সঙ্গে স্বামীজীরাও আছেন। নিচের দিকে চেয়ে মনে হোল স্বামীজীর মত যেন কেউ যাচ্ছেন, কিন্তু সঠিক বুঝতে পারলুম না। ভেড়াওয়ালার গ্রাম এল। এখানেই সে আজ থাকতে চায়, সকালে তাকলাকোট যাবে। রতনসিংয়েরও সেই ইচ্ছা। এখানে থাকার সুবিধা আছে, কিন্তু আমি বললুম, না এখানে নয়, তাকলাকোটেই গিয়ে থামবো। ভেড়াওয়ালা বাড়ীর ভিতর গেল, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম, খানিক পরে সে এলে আবার চললুম। বেশ সহজ পথ, ওঠা নাবা নেই বললেই হয়। বেশ জোরেই চলেছি। আকাশ ভালই, মাঝে মাঝে রোদও দেখা দিচ্ছে।

দূরে তাকলাকোট দেখা দিল। এখন পথ নেবে চলেছে। মধ্যাহ্নের পরেই তাকলাকোট পৌঁছলুম। যেখানে যাবার সময় তাঁবু পড়েছিল নদীর ধারে সেখানেই তাঁবু লাগান হল। আমি স্বামীজীদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে রইলুম। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেখি স্বামীজী ও সত্যসিন্ধুবাবু আসছেন। নিশ্চিন্ত হলুম।

কাল কি করে আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেন জিজ্ঞেস করায় স্বামীজী বললেন "আমি একটু পিছিয়ে পড়ায় সত্যসিন্ধুকে বলি আমার সঙ্গে থাকতে। আপনাদের সামনে দেখে অনুসরণ করছিলুম, তারপর এক ঢালু ভূমিতে আপনি নেবে গেলে আর দেখতে পেলুম না। তখন আন্দাজ করে চলতে থাকি, কিন্তু আপনাদের ধরতে পারলুম না। অন্ধকার হতে আমরা আর না এগিয়ে একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিই। সকালে আবার চলি এবং নিচে নদীর ধার দিয়ে লোক যেতে দেখে সেই পথ ধরি।"

"আপনাদের কাল খাওয়া হয়নি, আগে খাওয়ারই ব্যবস্থা করা হোক।"

সন্ধ্যার দিকে আমাদের তাঁবুতে এক অপরিচিতা মহিলা এলেন। ইনি বিজয়সিংয়ের ভগ্নি, নিজের মাকে নিয়ে কাল এখানে এসে পৌঁছন। নদীর ওপারে উপরদিকে যেখানে ভোটিয়ারা থাকে ও যেখানে মা ও আমি আগেরবার ছিলুম,

সেইখানে আছেন। ইনি আলমোড়ায় এক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী। ভাইয়ের নিকট গারবিয়াংএ আমার কথা শোনেন ও কিছু পূর্ব্বে রতনসিং উপরে যেতে তার কাছে আমরা ফিরেছি শুনে দেখা করতে আসেন। এবার কুম্ভ, সেইজন্য তিনি মাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের কেমন যাত্রা হল সব জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর আলাপে কথাবার্ত্তায় খুব সুখী হলুম। তিনি আমাকে একটু গুড়পাপড়ি বার করে দিলেন।

ভেড়াওয়ালাকে টাকা দিয়ে দিলুম। রতনসিংকে আগেই বলেছি ঘোড়ার চেষ্টা করতে গারবিয়াং পর্য্যন্ত। পাঁচটা ঘোড়ার দরকার, আমাদের চারজনের চারটে ও একটা মালের জন্য। এখান থেকে ফেরবার সময় মঠে লামার কাছ থেকে পাস নিতে হবে জানতুম না, জানলে আজই আনাতুম। চীনাদের কাছ থেকেও পাস নিতে হবে। আজ পাস না করার জন্য কাল এখান থেকে রওয়ানা হতে দেরী হয়ে যায়। এ স্থানটি বেশ ভাল, বাইরে ঘুরে ফিরে বেড়ালুম। কিছুক্ষণ পর রতনসিং এক ঘোড়াওয়ালাকে নিয়ে এল। কাল সকালে পাঁচটা ঘোড়া আনবে ঠিক হল।

৯

সকালে রওয়ানা হতে দেরী হয়ে গেল। ঘোড়াওয়ালাই দেরীতে এল, তারপর তাঁবু খুলে সব বেঁধে ছেঁদে নিতেও সময় লাগল। যখন তাও হল তখন রতনসিং গেল লামার অফিসে

আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পাস লিখিয়ে আনতে। চীনেদের কাছ থেকেও ছাড়পত্র দরকার। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম। রতনসিংয়ের আসতে বেশ বিলম্ব হল।

এই চিঠিগুলি যদি কাল আনান থাকত তাহলেই ঠিক হত, আমরা শীঘ্র শীঘ্র রওয়ানা হতে পারতুম। দেরী করে রওয়ানার ফলে লিপুতে যে কি হয়েছিল পরে বলছি।

আমরা চারজনে চারটে ঘোড়ার উপর বসে স্বচ্ছন্দে চললুম। আর একটা ঘোড়া মালপত্র নিয়ে চলল। সমান মাটের উপর দিয়ে চলেছি। দেখতে দেখতে পালায় এসে গেলুম। একটা ছোট জলের স্রোত পার হতে হবে কাঠের পুলের উপর দিয়ে। ঘোড়া থেকে নেবে পার হলুম। বেলা হয়ে গেছে, আজ এখানেই থাকা উচিত ছিল। রোদে লিপুর উপর বরফ গলবে। রতনসিং আর ঘোড়াওয়ালারা কিন্তু আমাদের নিয়ে চলল। আমার পূর্ব্বেকার লিপুর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে চললুম।

লিপুর চড়াইয়ের মুখে টিস্থম্ নদী এই কদিন আগে আমাদের যাবার সময় সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা ছিল। এর উপর দিয়ে চলে গেছি, জানতেও পারিনি। এখন স্থানে স্থানে বরফ নেই, হাঁ করা গর্ত্তের ভিতর নদীর খরস্রোত দেখা যাচ্ছে। আমরা গর্ত্তের পাশ দিয়ে বরফের উপর দিয়ে চলেছি। বরফ গলে গেলেই নিচে ওই নদীতে পড়া। দেখে ভয় হয়। আমরা

যে বরফের উপর দিয়ে যাচ্ছি তাও রোদে নরম ও একটু একটু গলছে। যত বেলা বাড়বে রোদ প্রখর হবে ততই গলবে, এবং আর কয়েকদিনের মধ্যে সব গলে যাবে। প্রথম বার মা ও আমি যখন আসি তখন এখানে একটুও বরফ পাইনি। তখন ছিল জুলাইর প্রায় শেষ আর এখন জুনের গোড়া। ঘোড়ার পা স্থানে স্থানে বরফে বসে যাচ্ছে। এইভাবে উঠতে উঠতে আমার ঘোড়ার পা এক জায়গায় বরফে অনেকটা বসে গেল। ঘোড়াটা পড়ে গেল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে নেবে পড়লুম। ঘোড়াওয়ালা এসে ঘোড়াটাকে টেনে তুলল। আমি হেঁটেই চললুম।

স্বামীজী ও সত্যসিন্ধুবাবুও নেবে চললেন। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে বরফের উপর দিয়ে চলা। বরফ নরম ও গলে পায়ের তলা দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। একটু পা পিছলে বা একটা বরফের চাঙড় খসলেই নিচে চলে যাওয়া। রোদ প্রখর, ক্রমান্বয়ে চড়াই। ফেরার উপায় নেই, কারণ এই পথ দিয়েই ফিরতে হবে। সামনেও এই বিপজ্জনক পথ। আমরা মাঝামাঝি এসে গেছি। রোদ যত প্রখর হচ্ছে ততই বরফ নরম হচ্ছে আর গলছে। রতনসিংকে বললুম যে বালকের ঘোড়া ধরে নিয়ে চলতে। স্বামীজী ও সত্যসিন্ধুবাবুকে খুব সন্তর্পণে চলতে বললুম। ঘোড়াওয়ালা ঘোড়াতে বসতে বললে, ঘোড়ায় উঠলে তাড়াতাড়ি চলা যাবে। এখান থেকে যত শীঘ্র সম্ভব বেরিয়ে যেতে হবে। আমরা তিনজন আবার ঘোড়ায় উঠে বসলুম। আমি সকলের পিছনে। একবার

ঘোড়ার পা বরফে চলে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল। সন্ত্রস্ত হয়ে ঘোড়ার উপর বসে রইলুম! কড়া চড়াই। ঘোড়া জোর দিয়ে পা টেনে টেনে উঠতে লাগল। লিপুর মাথার কাছে আরও জোর ঢাল চড়াই। ভয়ে ভুল করে ঘোড়ার লাগাম ধরে টানলুম। সে ঘাড় লম্বা করে যথাসাধ্য জোর দিয়ে আমাকে নিয়ে উঠছে। রাস টানায় তার ঘাড় উঁচু হল, চড়াই ওঠায় বাধা পড়ল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি রাস ছেড়ে দিলুম। যদি ঐভাবে রাস টেনে থাকতুম তাহলে বাধা পেয়ে সে আমাকে নিয়ে উল্টে পড়তে পারত। রাস টানা আমার অত্যন্ত ভুল হয়েছিল।

লিপু পার হলুম। হয়েই ঘোড়া থেকে নেবে পড়লুম। এখন ক্রমান্বয়ে নাবাই। সহজে নেবে চললুম বরফের ওপর দিয়ে। চার পাশেই বরফ। তবে লিপুর ওধারে বরফ নরম ও গলছিল এদিকে সেরকম নয়। রোদও নেই, আকাশ পরিস্কার নয়, যেন কুয়াশাচ্ছন্ন। চারিদিকে বরফের সঙ্গে এক হয়ে মিশে রয়েছে।

আমরা চলেই চলেছি বরফের রাজ্যের ভিতর দিয়ে। এই বরফের রাজ্যের যেন সীমা নেই। বরফই বরফ। তবে চলতে কষ্ট নেই। অনেকটা এসে যখন পথ প্রায় সমান হয়ে এসেছে তখন আবার ঘোড়ায় উঠলুম। এইবার মনে হচ্ছে বরফের রাজ্যের শেষ হয়ে আসছে। সামনে পাহাড়ের স্থানে স্থানে বরফশূন্য। কিছু দূরে সবুজ ঘাসও দেখা গেল। কালাপানি বুঝলুম আর দূরে নেই। কিন্তু ঘোড়াওয়ালা পথ ছেড়ে ঘোড়া

নিয়ে নিচে নামতে লাগলো। কেন জিজ্ঞেস করায় বললে এখানে ঘাস আছে, এখানেই ঘোড়া ছেড়ে দেবে। এখানেই আজ থাকবে।

আমি বললুম কেন, কালাপানি চলে চল। কিন্তু কালাপানিতে ঘোড়া ঘাস পাবেনা সেজন্য সে এখানেই থাকা স্থির করল। পথ ছেড়ে নিচে নেবে এলুম। জায়গাটা ভালই। দুখানা ঘর আছে। চারিদিকে বেশ ঘাস, কাছেই একটা জলের স্রোত। কালাপানির চেয়ে বোধ হয় ভালই থাকার জায়গা হল। ঘরটা অবশ্য পরিষ্কার নয়।

সকালে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চললুম। কালাপানি এল, আমরা নাবলুম না। এখানে একদল কৈলাশ যাত্রীকে দেখি। নৈনীতালে একজন থাকেন তিনি যাত্রী নিয়ে কৈলাশ যান। এ দল তাঁরই পার্টি। দুচারজন যাত্রীর সহিত কথা হল, কিন্তু আমরা দাঁড়ালুম না। এগিয়ে চললুম গারবিয়াং। গাছপালার ভিতর দিয়ে পথ, বড় মনোরম। চতুর্থবার এই পথে যাচ্ছি। প্রথমবার দুবার, এবার দুবার, কিন্তু এপথ পুরোন হয়না আর ভোলাও যায় না।

আর গারবিয়াং দূর নয়। গারবিয়াংয়েই কৈলাশ যাত্রা শেষ বলা যায়। গারবিয়াংয়ে থাকার জায়গা ভাল নেই, তাই স্থির করলুম যে বুধিতে গিয়ে আজ থাকব। বুধিতে থাকলে আর একটা সুবিধা এই যে তাহলে মালপায় থাকতে হবেনা,

জিপতি পর্য্যন্ত চলে যাওয়া যাবে। মালপাতে থাকার জায়গা খারাপ। প্রথমবার মালপাতে থেকে শিক্ষা হয়েছিল। সেজন্য এবার মালপায় যাতে থাকতে না হয় সেই হিসাবে চলেছি।

গারবিয়াং পৌঁছে ধর্ম্মশালায় গিয়ে জিনিষপত্র নাবিয়ে ঘোড়াওয়ালাদের হিসেব মিটিয়ে দিলুম। যে সব পোষাক, কম্বল ভাড়া নেওয়া হয়েছিল তাও ফেরত দিলুম। তারপর বিজয়সিংয়ের কাছে যেতে তার কাছে যে টাকা রেখে গিয়েছিলুম তা সে ফেরত দিল। তাকে বললুম আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য কুলি ঠিক করে দিতে। বালকের জন্য কাণ্ডিও চাই। একদল কুলি নিচে থেকে এসেছে, নিচে ফিরে যাবে। বিজয়সিং তাদের সঙ্গে দর নিয়ে কথা কইতে লাগিল। তাদের প্রস্তাব একটু বেশি হলেও তাদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবেনা মনে হল। এখন ঠিক সময় পাওয়া গিয়েছে, যদি পরে কুলি না পাই। তা ছাড়া এখানে কালক্ষেপ করা যায় না, বিলম্ব হলে বুধি পৌঁছান যাবে না। তাই তাদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে আমি ধর্ম্মশালায় ফিরলুম তৈরী হওয়ার জন্য। রান্না খাওয়া সেরে নিতে বেশি সময় লাগল না।

১০

কৈলাশ যাত্রা সম্পূর্ণ হওয়ায় মনে বড় সন্তোষ। এখান থেকে বুধি চার পাঁচ মাইল, নাবাই পথ। বেশি সময় লাগল না। বেলা থাকতেই পৌঁছে গেলুম ও যাবার সময় যে

স্কুল ঘরে ছিলুম সেখানেই গেলুম। এখন আর কোন তাড়া, উদ্বেগ নেই। ধীরেসুস্থে সব হল। রতনসিং গারবিয়াংয়ে থেকে গেছে। এখন আমরা চারজন একটা কাণ্ডিওয়ালা ও দুজন জিনিষপত্রের কুলি। এখান থেকে জিপ্তি বেশ দূর, প্রায় সতের মাইল। চড়াই ও উতরাই দুইই যথেষ্ট। সেজন্য প্রত্যুষেই রওয়ানা হলুম। মালপা পর্য্যন্ত সোজা বা নাবা। মালপা প্রায় সাড়ে ছ মাইল। মালপাতে রান্না খাওয়া করে আবার এগলুম। খানিকপরে একটা বেশ খাড়া চড়াই, তারপর আবার অতটাই নাবাই। কালীগঙ্গার ধার দিয়ে চলেছি। বিকেল হয়েছে, তখন জিপ্তির চড়াই আরম্ভ হল। এইটে বড় তীব্র চড়াই। শেষের দিকে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। চড়াই যেন শেষ হয় না। কষ্টে ধীরে ধীরে উঠে যখন জিপ্তিতে পৌঁছই তখন সন্ধ্যা।

পরদিনও লম্বা রাস্তা। পঙ্গু পর্য্যন্ত যাব মনে করেছি। পঙ্গু সতের মাইল, তবে আজকের মত চড়াই নেই। পাহাড়ে খুব ভোরে না চললে উপভোগ করা যায় না, আর বেশি চলাও যায় না। পরদিনও প্রত্যুষে রওয়ানা হই। সিরকাতে রান্না খাওয়া সেরে এগিয়ে চললুম। সির্কা থেকে সুসার চড়াই তারপর নাবা পঙ্গু পর্য্যন্ত। পঙ্গু পৌঁছতে সন্ধ্যা হল। পঙ্গুর কাছাকাছি ক্লান্তি বোধ হওয়ায় পকেটে আকের গুড় ছিল, তাই একটু খেলুম। পকেটে গুড় ও ছোলা ভাজা ছিল। ভাল জিনিষ। চিনির চেয়ে গুড় ভাল, মধু আরো ভাল। পঙ্গুতে

প্রথমবার মা ও আমি যে দোকানে ছিলুম, এবারও সেইখানে গেলুম। জিনিষ পত্র খুলে রাত্রে থাকার ব্যবস্থা হল।

এখান থেকে ধারচুলা ষোল মাইল। ভোরে ভোরে চললে বেলা থাকতেই ধারচুলা পৌঁছে যাবো। শেষরাত্রেই ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লুম আর সকলকে ডেকে দিলুম। আকাশ পরিস্কার, শেষ জ্যোৎস্না পেয়ে বেরিয়ে পড়ি। খানিকটা চলার পরও পূর্ব্বদিক উজ্জল হয়নি দেখে সকলে এক জায়গায় বসলুম, আর বসার সঙ্গেই সকলের চোখ বুজে এল। তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। চোখ খুলে দেখি ভোরের আলোয় আকাশ উদ্ভাসিত। এ জায়গাটি বড় সুন্দর, খানিকটা সমতল, চারিদিকে বিনা বাধায় দৃষ্টি চলে যায়।

উঠে পড়ে চলতে আরম্ভ করলুম। পথ নেবে চলেছে খেলা পর্যন্ত। আর ঠাণ্ডা নেই, বরং রোদে চলতে গরমই বোধ হচ্ছে। খেলায় দাঁড়াবার কথা নয়। একটা গাছের ছায়ায় পাথরের উপর একটু বসে আবার এগোলুম। এই গাছের নিচে এখানকার একজন লোকও এসে বসে। সেও আমাদের সঙ্গে উঠে চলল। বললে আসকোট যাবে। আসকোটে স্কুলে তার মেয়ে পড়ে, তাকে আনতে যাচ্ছে। মেয়ের বয়স বছর চোদ্দ। লোকটি বেশ। আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে পাশে পাশে চলেছে। পথ সহজ নাবাই এলা পর্য্যন্ত, কিন্তু পথের দিকে মন নেই। লোকটির কথার প্রসঙ্গ বড় আশ্চর্য্য করেছিল, আর সমস্ত মনকে তার কথার মধ্যে নিবদ্ধ রেখেছিল।

সে বললে "আচ্ছা, বাবুজী, সামনে এই যে গাছ দাঁড়িয়ে আছে, এর তলায় যদি একটা কুড়ুল পড়ে থাকে ত কুড়ুলটা গাছ কাটতে পারে না। যদি এক মানুষ এসে কুড়ুলটা তুলে নিয়ে গাছে আঘাত করে তবেই গাছ কাটে। কুড়ুল না থাকলে মানুষ কিন্তু গাছ কাটতে পারত না, অথচ মানুষ বলবে আমি গাছ কেটেছি। কিন্তু মানুষ হাত না দিলে কুড়ুলও যেমন গাছ কাটতে পারত না তেমনি কুড়ুল না পেলে মানুষও গাছ কাটতে পারত না। দুইয়ের মধ্যে কেহই ত বলতে পারে না যে আমি গাছ কেটেছি। তাহলে কে গাছ কাটল ?"

প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে দেখলুম। প্রশ্নটি যেমন গভীর তেমনি অর্থপূর্ণ। এ প্রশ্ন কারো নিকট শুনিনি, মনেও ওঠেনি।

একটু ভেবে বললুম "তোমার কথা ঠিক। মানুষ বলতে পারে না যে সেই গাছ কেটেছে, তেমনি কুড়ুলও বলতে পারে না যে সে কেটেছে। দুইয়ের সংযোগেই কাটা সম্ভব হয়েছে। এই রকম সব কিছুই দুইয়ের সংযোগেই হয়, একের দ্বারা কিছু হয় না, কিছুই ঘটে না।"

প্রশ্নটি সত্যই খুব ভাবিবার মত। দুয়ের এই নিবন্ধ, দুয়ের মধ্যে পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, এ যে সব তথ্য,

সব সৃষ্টি, সব ঘটনা, সব জ্ঞান অভিজ্ঞতার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আমরা তা ভেবে দেখি না। না ভেবে, না বুঝে, কত রকম ধারণা করে নিই। কত রকম কথা মেনে নিই, বিশ্বাস করে নিই, যার জন্য সত্যের সন্ধান পাই না। এই রকম না ভেবে না বিচার করে মেনে নেওয়ার দরুণই ধর্ম্ম বিষয়েও অনেক রকম গোলমেলে কল্পনা ধারণা মনে এমন চেপে বসে যে আমরা তা থেকে মুক্ত হতে পারি না। ধর্ম্মের প্রসার ও বিস্তার সেইজন্য হয় না। ধর্ম্ম যেন পঙ্গু হয়ে অন্ধ বিশ্বাস ও wishful thinkingয়ের পাঁকে পড়ে আটকে গেছে।

সব ধর্ম্মেই একরকম ধরে নেওয়া হয়েছে যে সৃষ্টি এবং সব কিছুই এক হইতে উদ্‌ভূত। মূলে এক শক্তি, এক চৈতন্য, এক কারণ। সেই শক্তি, সেই চৈতন্য, সেই কারণকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, God বলা হয়েছে। এরকম মনে করার কারণ এই যে আমাদের ধারণা এবং সাধারণতঃ অভিজ্ঞতাও তাই যে সব জিনিষেরই একটা গোড়া, একটা আরম্ভ আছে, আর একটা শেষও আছে। অতএব এই সৃষ্টিরও একটা আরম্ভ আছে আর সেই আরম্ভের একটা কারণ ও একটা ক্ষণও আছে। একটা লাইন টানলে একটা পয়েণ্টে তার শুরু এবং একটা পয়েণ্টে শেষ হয়। মোটামুটি চোখে তাই দেখায়। কিন্তু যে পয়েণ্ট হইতে লাইনের আরম্ভ আমরা মনে করি সেখানেই লাইন সৃষ্টির আদি কারণ নয়। তার পিছনে একের পর এক অশেষ কারণ রয়েছে, যেমন কি খড়ি, কলম, বা পেনসিল আনা, তা হাতে

ধরা, ধরার শক্তি, লাইন টানার ইচ্ছা, কল্পনা, ঐরূপ ইচ্ছা কল্পনার কারণ ইত্যাদি। একের পিছনে এক কারণ, তার শেষ নেই। মানুষ যতটা পেরেছে কারণের পিছনে কারণ খুঁজেছে, যখন আর পারেনি তখন থেমে গিয়ে এক আদি কারণ মেনে নিয়ে তাকেই ভগবান বলেছে। এই আদি কারণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মনে করার ফলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হয়েছে, আর মানুষের মনে রকমারি গণ্ডগোল ও confusionও এসেছে। এই কারণের জের টেনে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় থেমে যাওয়া আর মনে করা যে তার পিছনে আর কিছু নেই, ঐ আদি কারণ, এর মধ্যে যুক্তি না থাকিলেও তাই করা হয়েছে। এবং উহার পিছনে যাবার ইচ্ছা ও চেষ্টাকে নিরর্থকও বলা হয় ও হয়েছে। ঐ এক কারণ, ঐ ব্রহ্ম। তিনি অনাদি, অনন্ত, নির্বিকার। তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি। এই রকম বলে মানুষ একটা অবলম্বন পেতে চেষ্টা করেছে যার উপর ভরসা করে ও বিশ্বাস শ্রদ্ধা স্থাপন করে অসহায় অবস্থায় কিছু স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। এই অবলম্বনকে প্রথমে নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্ম বলা হলেও তাঁকে পরে সগুণ, সবিকার করা হল যেহেতু নির্গুণ নির্বিকার ঈশ্বর হইতে কিছুই পাওয়া যায় না। মানুষ কেবল ঈশ্বরকে নানা রূপগুণ বিশেষণ দিয়েই থামল না, তাঁকে মানুষের ছাঁচে, মানুষের ভাব, ধারণা, অনুভূতি দিয়ে গড়ল। ব্রহ্ম নাম রাখলেও ব্রহ্মকে যেন ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। শুধু

ব্রহ্মাণ্ড কেন এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে কেবল মানুষ ছাড়া এই ব্রহ্মের আর কোন চিন্তা, ভাবনা, কাজকর্ম্ম নেই, ধীরে ধীরে এই রকম ধারণা ও বিশ্বাস মানুষের মন আচ্ছন্ন করিল। ভগবানের এবং তাঁর গুণ, কার্য্য, কার্য্যের উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সে মনে করিল সবই মানুষ সংক্রান্ত, মানুষকে লইয়া। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের perspectiveয়ে ফেলে দেখা হল না যে ভগবানকে যে সব attributes দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কোনটাই আছে কিনা, আর থাকা সম্ভবই কি না। মুখে বলিলেও যে তিনি সৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তা কার্য্যতঃ ভগবান হইয়া গেলেন মানুষের দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড যেমন চলছে চলুক তাঁর সে চিন্তা নেই, কেবল তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তা মানুষের উপর। মানুষ কি চায়, কি করছে, কি প্রার্থনা করছে, কেবল এই দেখা শোনা ছাড়া তাঁর যেন আর কিছু করার নেই। মানুষের জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে অবতার হয়েও মানবলোকে আসতে হয়। এই রকম ধারণা ও বিশ্বাস ধর্ম্মতত্ত্বে গড়ে উঠল, আর মানুষকে মোহিত করল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল না যে, ভগবান যে মানুষকে শোধরাতে, তাকে ভাল পথে আনতে, বার বার অবতার হয়ে আসেন আর কোন জীবের জন্য আসেন না তার কারণ কি এই যে মানুষই তাঁর সৃষ্টিতে সব প্রাণীর চেয়ে মন্দ, সবার চেয়ে কুপথগামী?

কেহ ইহাও জিজ্ঞাসা করিল না যে যদি সৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তা প্রয়োজন তাহলে ত সৃষ্টিকর্ত্তারও একজন সৃষ্টিকর্ত্তা থাকা

আবশ্যক এবং তাঁরও এক স্থষ্টিকর্ত্তা থাকা চাই। এবং এই রকম একের পিছনে এক স্থষ্টিকর্ত্তার আবশ্যক। এই রকম প্রশ্নের জের বন্ধ করিতে ধর্ম্মতত্ত্বে বলা হল যে না, এই স্থষ্টির এক স্থষ্টিকর্ত্তা আর ওই স্থষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং-স্থষ্ট। উঁহার পিছনে আর কোনও কারণ নেই। ধর্ম্ম বিষয়ে লোক সব কথাই বিনা বিচারে মেনে নেয় বলেই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিল, আর প্রশ্ন তুলিল না। স্থষ্টিকর্ত্তার হঠাৎ স্থষ্টি করার ইচ্ছা ও প্রেরণা কি করে এল, তা জিজ্ঞাসা করিল না। ইচ্ছা ও প্রেরণা একটা প্রতিক্রিয়া, reaction, যা বাইরের কোন ক্রিয়া, (action), হইতেই আসতে পারে। ব্রহ্মের বাহিরে স্থষ্টির পূর্ব্বে যদি কিছুই ছিল না তাহলে তাঁর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া, ইচ্ছা, বাসনা, প্রেরণা উদ্ভূত হওয়া সম্ভব নয়। শেষ কারণ বলে কিছু থাকতে পারে না যেহেতু কোন কারণকে ক্রিয়াশীল activate করিতে অন্য কারণের প্রয়োজন। সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করিতেও একটা কারণের দরকার। যে কোন কারণই হোক তার পিছনে আর এক কারণ না থাকিলে ঐ কারণ অক্রিয় হয়েই থাকে। এই কারণের চেন (chain) কোথাও শেষ হতে পারে না। তার শেষ আমাদের কল্পনা ধারণার বাইরে। সেইজন্য এই কারণের একটা শেষ ধরিতে হইলে স্থষ্টিকে অনাদি বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। স্থষ্টির আদি ধরিতে গিয়াই বেদান্তে এক আদি স্থষ্টিকর্ত্তার কল্পনা এসেছে যাহা যুক্তি, প্রশ্ন ও বিচারকে আর এগোতে দেয়নি। এই ভাবেই অদ্বৈতবাদ প্রচলিত হয়েছে।

ব্রহ্ম অদ্বৈত এবং অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞান, যে জ্ঞান লাভ হইলে জ্ঞানী বলেন সোঽহম্। কিন্তু অদ্বৈতবাদের মত অদ্বৈত জ্ঞানও সম্ভব নয়। জ্ঞানের জন্য দুয়ের প্রয়োজন, the knower and the thing to be known, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞান উপলব্ধির ক্ষমতা বা চৈতন্য। সেজন্য অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যাই বলি না কেন তার অনুভূতি সম্ভব নয়। যতক্ষণ আত্ম-অনুভূতি আছে ততক্ষণ জ্ঞান। যখন আত্ম-অনুভূতি ব্রহ্মে মিলিয়ে যায় তখন কোন জ্ঞানই থাকে না, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম চিন্তা কিছুই থাকে না। নদী যখন সমুদ্রে গিয়ে মিলিয়ে যায় তখন সে তার অস্তিত্ব, অনুভব, জ্ঞান সবই হারায়। সমুদ্র কি সে জানতে পারে না। অদ্বৈত জ্ঞানের কথা যাঁরা বলেন তাঁরা ঐ জ্ঞান না পেয়েই বলেন। যে নদী সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে সে যদি সমুদ্র হইতে উঠে আবার সেই আগের নদী হইতে পারে তবেই সে অন্য নদীকে সমুদ্র কেমন, সমুদ্রে লীন হওয়া কি, তা বলতে পারে। কিন্তু তা যেমন সম্ভব নয় সেই রকম কোন ব্যক্তিরই ব্রহ্মে লীন হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়। একদা ঋভুঋষি তাঁর শিষ্যকে অদ্বৈতজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে, তাঁকে চিন্তা করিতে বলিয়া চলিয়া যান। কিছুদিন পর তিনি দেখিতে আসেন শিষ্যের কতদূর জ্ঞান হইল। তাঁকে দেখে শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন "প্রভু, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? কোথা হইতে আসছেন?" শুনে ঋষি বললেন "এই কি তোমার অদ্বৈতজ্ঞান হয়েছে?

আমি কি সর্ব্বময়, সর্ব্বব্যাপী নয়? আমার কি কোথাও যাবার বা কোথা হইতে আসার স্থান আছে?" শিষ্য অপ্রস্তুত, কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন যে "প্রভু, আপনার যদি অদ্বৈতজ্ঞান হইয়া থাকে ত আমাকে আপনার হইতে পৃথক অনুভব করিতেছেন কি করিয়া? আর আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রেরণাই বা আপনার মধ্যে কি করিয়া আসে আর তাহার অর্থ ই বা কি?

যাহা হোক্, এক সৃষ্টি ও তার এক সৃষ্ঠি কর্ত্তা, এই ধারণার উপরই সব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যকার বেদান্তের এই রকম ধারণা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি দুইকে এনে আর দুইকেই অনাদি বলে সৃষ্টি রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করেছেন। কতটা পেরেছেন সে কথা ভিন্ন, কিন্তু তাঁর approach বেদান্তের চেয়ে যুক্তি সঙ্গত মনে হয়। সায়েন্সের দৃষ্টিতেও একটি particle হইতে সৃষ্টি রচনা সম্ভব নয়, অন্ততঃ দুটি পার্টিকল না থাকিলে আকর্ষণ বিকর্ষণ কিছু সম্ভব নয়। gravitation বলিয়া কিছু থাকে না।

তবে পুরুষ ও প্রকৃতি দুইকে আনলে বা দুটি পার্টিকেলের কল্পনা করিলেও সৃষ্টিকে ঘিরে যে রহস্যের পর্দা রয়েছে তা ভেদ হয় না। সেই একই কথা ওঠে যে এক পুরুষ বা এক পার্টিকলের পিছনে কি ছিল, সেও যেমন অজ্ঞেয়, পুরুষ ও প্রকৃতি বা দুই পার্টিকেলের পিছনে কি থাকা সম্ভব তাহাও অজ্ঞেয়। সৃষ্টির রহস্য অজ্ঞেয়ই থাকিবে। যিনিই চিন্তা করিবেন, মুক্ত

দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিবেন, তিনিই বলিবেন, নেতি, নেতি। তিনি তবে থামিবেন না, এগিয়েই চলিবেন যেমন explorer চলিয়া চলেন receding horizon ভেদ করিতে, যেমন তিনি হিমালয়ের অভ্যন্তরে বাঁকের পর বাঁক ঘুরিয়া চলেন যিনি সামনের বাঁকের পিছনে কি বৈচিত্র্য আছে তাহা দেখিতে আগ্রহী যদিও তিনি জানেন যে এইরূপ বাঁক একের পর এক আসিবে, বাঁকের শেষ নেই।

তবে এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে একটা ধরে নেওয়া, মেনে নেওয়া বিশ্বাসের দড়ি ধরিয়া চলা যায় না, কারণ এরকম দড়ি একপা যেতেই ছিঁড়িয়া যায়। চলিতে হইবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে করিতে, একটা উত্তর মেনে নিয়ে বসে গেলেই আর এগোন যাবে না। জ্ঞানের পথে কোন প্রশ্নের উত্তর একটা সিদ্ধান্ত নয়, এক প্রশ্নের উত্তর আর এক প্রশ্ন। এক প্রশ্নের উপর হইতে আর এক প্রশ্নের উপর পদক্ষেপ ফেলিতে ফেলিতেই চলা যায়।

খেলার লোকটির প্রশ্ন সত্যই গভীর। গভীর ভাবেই চিন্তা করবার। সব বিষয়ের ভিতরেই যে দুইয়ের সম্বন্ধ থাকে তা আমরা ভেবে দেখিনা। আমাদের জীবনে, ব্যবহারে, যদি আমরা তা ভেবে দেখি তাহলে আমাদের অহংকার, ক্রোধ, হিংসাদি কতকটা অন্ততঃ সংযত হতে পারে। কারণ একতরফা বিচারই সব বৃত্তিগুলিকে উসকানি দেয়। যে কৃতিত্বের জন্য

অহংকার করি তাতে অন্যেরও অবদান আছে এটা ভেবে দেখলে অহংকার আর থাকেনা। সেই রকম উত্তেজিত অন্য বৃত্তিও ঐরূপ বিচারে প্রশমিত হইতে পারে।

আমার এই চিন্তাশীল সঙ্গীটি আরও এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে।

"বাবুজী, আমার মেয়ের এই বছরচোদ্দ বয়েস হল। আমি ভাবছি ওর বিয়ে দেব কি না। বিয়ে হলেই সংসার, সংসারে জড়িয়ে পড়া, আর তাই থেকেই দুঃখ শোক। বিয়ে না করলে সে সংসারের অনিবার্য্য দুঃখশোক হতে বেঁচে যাবে।"

লোকটি দেখতে নিরক্ষর, আমরা শিক্ষিত, বই পড়েছি, পরীক্ষায় পাশ করেছি। কিন্তু কচিৎই এ ধরণের প্রশ্ন আমাদের মনে আসে। সুখ দুঃখের কথা হয়, কিন্তু সুখ দুঃখের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিনা। জীবনে সুখদুঃখ, অশান্তি, ক্ষোভ, নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে কোন না কোন প্রকারে আসিয়াই থাকে। ঋষি মার্কণ্ডেয় সংসারকে দুঃখময় বলিয়াছেন। অনেক দুঃখই অপরিহার্য্য হইলেও তার কারণ চিন্তা ও বিচার করিয়া দেখিলে দুঃখের তীব্রতা কিছু কম হইতে পারে।

তাকে বললুম "তোমার কথা ঠিক, কিন্তু তোমার এই যে জ্ঞান হয়েছে এটা সংসারের ভিতর দিয়েই হয়েছে। সংসার না দেখলে, সংসারের অভিজ্ঞতা না হলে হোত না। তোমার এই জ্ঞান সংসারের ভিতর দিয়ে এলেই হয়, দূর থেকে বিচার

করে হয় না। এই জন্যই সংসার আশ্রমের অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধীরে ধীরে আসে, সেইজন্যই চার আশ্রমে জীবনযাপন করার কথা বলা হয়েছে, ব্রহ্মচর্য্য, সংসার, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। একটা ধাপ ডিঙ্গিয়ে আর একটা ধাপে যাওয়া যায় না। মোহ মায়ার খেলা বুঝতে হলে মোহ মায়ার ভিতর দিয়েই আসতে হবে। তোমার মেয়েকে সংসার থেকে আলাদা রাখতে গেলে ওর মন সংসারের দিকেই চেয়ে থাকবে এবং তাকে সংসারের টানের বিরুদ্ধে সদাই সংগ্রাম করতে হবে। তাতে লাভ হবে না। শুদ্ধ জ্ঞান-বিচার, বৈরাগ্য, মনে আসবে না। ওকে সংসারে প্রবেশ করতে দাও। এই প্রকৃতির নিয়ম। তারপর যেমন সংসারের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলবে তেমন তেমন তার মন মুক্ত হতে থাকবে।”

সে চুপ করে চলল, আমিও তার সঙ্গে চুপ করে চললুম। আমার কথা যেন উপদেশের মত হল। উপদেশে যে কিছু হয়না তা জানি, কিন্তু তাকে আর কি বলতুম ? যদি উপদেশে কিছু ফল হত ত কত উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাতে কি হয়েছে ? মানুষ নিজের প্রকৃতি অনুযায়ীই চলে। উপদেশে তার প্রকৃতি বদলায় না। এই যে চার আশ্রমের কথা বলা হয়েছে কেউই ত তা পালন করে না। বছরে ঋতুর পরিবর্ত্তনের সহিত পোষাকে খাদ্যে ও আরো অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন করে, দিনের মধ্যেও দুই বেলা করে, কিন্তু জীবনে বছরের পর বছর একই কাজ, একই পেশা, একই ঘরে বাস, একই অর্থচিন্তা,

একই হিসাব-নিকাশ, একই জীবনধারা, একই ঘরের কথা আর 'খবরের' কথা করে চলে, তার change পরিবর্ত্তন করে না। এই সবের বাইরে তাদের চিন্তা যায় না। গেলে দেখত বিশ্বের মধ্যে আরও কত কি আছে, কত কি দেখবার ভাববার আছে। জীবনটাকে একটা ছোট ঘরের পরিস্থিতির মধ্যে আবদ্ধ রেখে জীবনের অনেক কিছু হতে তাহারা বঞ্চিত হয়। ধন-সম্পত্তি, রাজনৈতিক পদ ও ক্ষমতার পিছনে সারাজীবন লোকে ছোটে, তাতে যে কেবল দুশ্চিন্তা, দুর্ভোগ, ভয়, অশান্তিই আসে তা নয়, ঐ সবের অধিকারী না হয়ে তাদের দাস হয়ে যায়। একজন আমেরিকান মহিলা Neilsen তাঁর এক চিঠিতে একবার একটি বড় সত্যকথা লেখেন Possessions possess us more than we possess them. সত্যই সাধারণত দেখা যায় যে সম্পত্তিই তার অধিকারীর উপর আধিপত্য করে, অধিকারী সম্পত্তির উপর করে না। সম্পত্তিতে আরও যোগ করিয়া তাহাকে বাড়ান, তাহার দেখাশোনা, রক্ষণা-বেক্ষণ করা, ইহাতেই অধিকারীর মন, প্রাণ, ধ্যান, চিন্তা সব জড়িয়ে থাকে, আর সম্পত্তি তাহার অধিকারীর পরিশ্রম, আহরণ, ভয়, দুশ্চিন্তা, দিবারাত্র পাহারা দেওয়ার ক্লেশ, সে সবের দিকে ভ্রুক্ষেপও না করে আরামে নিরাপদে বর্দ্ধিতে থাকে, ব্যাংকে, safe vaultএ, ইমারতে। আবার রক্ষকের সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও ইচ্ছামত অন্যত্র চলে যায়। এক নবাব প্রতিদিন রাত্রে তাঁহার খাজানার সামনে বসিতেন আর খাজাঞ্চিকে বলিতেন

খাজানায় তাঁহার যা সব সোনা রূপা হীরা মুক্তা আছে তাহা বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে। ধন সম্পত্তি দেখাতেই তাঁর ছিল তৃপ্তি, সুখ, খরচ করিতে পারিতেন না। রোজ কত হচ্ছে, কত বাড়ছে, তারই হিসাব নিতেন। ইনি নবাব ছিলেন বলিয়া ইঁহার কথা লোকে শুনিয়াছে, কিন্তু এইরকম বহুলোক আছেন যাঁহারা ঐ নবাবের মতই ধন সম্পত্তির দাস ও প্রহরী হইয়াই থাকেন যদিও বলেন ও মনে করেন যে তাঁরা সম্পত্তির মালিক। এক ভদ্রলোক প্রায়ই বলেন যে তাঁহার রঁাচীতে চমৎকার বাগান বাড়া আছে, সেখানে নানারূপ ফুল ফল সবই আছে। কিন্তু তিনি সেখানে থাকেন না। একদিন বলেই ফেললুম "—বাবু, রঁাচীর বাগানবাড়ী কিন্তু আপনার নয়, যে চৌকিদার সেখানে থাকে তার, কারণ সেইত ভোগ করে, আপনি ত থাকেন না, ভোগ করেন না।"

আর একজনের কেদার বদ্রী হয়ে আসার পর থেকেই শিবরাত্রে পশুপতিনাথ যাবার ইচ্ছা। দেখা হইলেই ঐ বিষয় কথা হইত, আমি উৎসাহও দিতুম। মাঘমাস প্রায় হয়ে গেল, শিবরাত্রীর আর দেরী নেই। সকালে একদিন দেখা হল, জিজ্ঞেস করলুম "কি, পশুপতিনাথ যাচ্ছেন ত?" "না, হল না, বরাতে না থাকলে কি হয়? এক ছেলে বাইরে গেছে, আমরা এখন গেলে বাড়ী দেখবে কে?"

বাড়ী দেখবে কে? তাঁর প্রভু, বাড়ী-সম্পত্তি, তাঁকে এক সপ্তাহের ছুটি দিল না। কাজেই পশুপতিনাথ যাওয়া ছেড়ে

তাঁকে প্রভুর রক্ষণা-বেক্ষণ dutyতেই থেকে যেতে হল। বরাতই বটে নইলে তাঁর মালিক, বাড়ী মহাশয়, ক'দিনের ছুটি দিলেন না।

এই রকমই ত দেখা যায়। বাজার-হাট কেনা-বেচা লোকে সকালেই করে, সমস্ত দিনরাতই করে না। সকালে একবার বাজার করে নিয়ে তাইতেই দিন রাত্রি চালায়। কিন্তু সম্পত্তির বাজার সারা জীবন ধরেই করে আর ভঁাড়ারে রাখে। এ বাজারের নেশা যেন ভাঙ্গে না।

খেলা হতে এলা পর্য্যন্ত পথ নেবে চলেছে। আমরা পাশাপাশি চলেছি, চলার দিকে মন নেই। লোকটি কত চিন্তাশীল। হয়ত সে নিরক্ষর, আর আমি ক'খানা বই পড়া অভিমানী। কিন্তু আমার চেয়ে সে বেশি চিন্তাশীল, তাই সে এ রকম বিষয় ভাবে, আমি ভাবিনা। তার কথা, তার চিন্তাশীলতা, তার গভীর প্রশ্ন কতবার মনে আসে। যে শিক্ষিত, সভ্য, উন্নত (?) সমাজে আমরা থাকি সেখানে এরকম লোক দেখিনা, এরকম প্রশ্ন ওঠেনা, এরকম আলোচনা হয় না। জ্ঞান, অনুভূতি, বিচারশক্তি যদি বই পড়ে হত ত পৃথিবীতে অনেক স্কুল কলেজ হয়েছে জ্ঞানীর অভাব হত না। যেমন ফুলের সৌরভ তার ভিতর হইতেই উদ্ভূত, উপর থেকে সুগন্ধি ঢাললে হয়না, সেইরকম মানুষের ভিতর হইতে না আসিলে বাইরে থেকে জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা দেওয়া যায় না।

খেলা থেকে নেবে এসে আমরা এলায় দাঁড়ালুম। এখানে একটা দোকান ও দুচারটে ঘর আছে। এখানেই রান্নাখাওয়া হবে ঠিক হল। আমার সঙ্গীটি দাঁড়াল না, তাকে অনেকদূর যেতে হবে। তার সঙ্গে কথায় বড় আনন্দ পাই। তার কথা মনে পড়লেই আবার তার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে হয়।

এলা নিচু জায়গা, হাজার তিনেক ফিট্। দিনদুপুরে রোদও কড়া। এই রোদে চলে এসেছি, দারুণ তেষ্টা। নিচে কালী-গঙ্গার জল খুব ঠাণ্ডা। দোকান থেকে চিনি নিয়ে সরবত করলুম। সকলকে এক এক গ্লাস দিলুম। আমি পরে আর এক গ্লাস করে খেলুম। তারপর খিচুড়ি হল।

খেয়ে উঠে চলবার সময় কিন্তু আমার আর পা চলে না। রোদে এসে ঐ ঠাণ্ডা জলে অত সরবত খাওয়ার প্রতিক্রিয়া। কিছুতেই চলতে পারছি না। একটা কাণ্ডি হলে হয়, কিন্তু এখানে কাণ্ডি কোথায় ? অতি ধীরে পা টেনে টেনে চলতে লাগলুম। এমন সময় সামনে পাহাড়ের উপর দিয়ে কয়েকজন নেবে আসছিল। তাদের দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলুম কেউ আমাকে ধারচুলা পর্য্যন্ত পিঠে করে নিয়ে যাবে কিনা। একজন রাজী হল, চার টাকা চাইল। বেশ, কিন্তু কিসে বসাবে, কাণ্ডি নেই। আমার সঙ্গে লাল রংয়ের একখানা র‍্যাপার ছিল। সে আমাকে নিজের পিঠের উপর নিয়ে ঐ র‍্যাপার দিয়ে আমার পাদুটো মুড়ে নিজের পিঠে রেখে পেটের উপর বাঁধলো। আমি

দুহাতে তার গলা জড়িয়ে তার পিটের উপর ভর দিয়ে রইলুম। আড়ষ্ট হয়ে তার পিঠের উপর এইভাবে পড়ে রইলুম। সে নিয়ে চলল।

ধারচুলা এল। আমাকে নাবাল কিন্তু আমার পা এমন অবশ হয়ে গেছে যে প্রথমটা দাঁড়াতেই পারিনা। একবার দাঁড়াবার পর কিন্তু ঠিক হয়ে গেল। শরীরও ঠিক হল। রায় সায়েব প্রেম বল্লভের ছেলে বেরিয়ে এল। আমাদের থাকার ঘর ঠিক করে দিল।

আমার মনে হয়েছিল যে এখানে এসে কয়েকজনকে খাওয়াব। প্রেমবল্লভবাবুর ছেলেকে বলাতে সে বলল বেশ ত। আরও বলল কয়েকজনকে বস্ত্র দিতে। আমি বললুম "বেশ ভাল, কাকে কি দেওয়া হবে তুমিই ঠিক কর।" প্রথমবার এখান থেকে কমলসিং আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল, তার খোঁজ নিলুম, কিন্তু সে এখানে এখন নেই। বস্ত্র দেবার প্রস্তাবে আমার মনে হল সেবার যে প্রতাপসিং আমাদের নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়েছিল তার মায়ের জন্য একখানা কাপড় নেব। এখান থেকে মাইল দুয়েকের মধ্যে পথে প্রধানের বাড়ী। যাবার পথে তাকে দিয়ে যাব। প্রেমবল্লভবাবুর ছেলের দোকান থেকে সে যেমন বললে সেই রকম কাপড় কিনলুম ও পরদিন কাকে কাকে খেতে ডাকা হবে, কি খাবার হবে, ঠিক হল। খাবার হবে পুরি, হালুয়া ও আলুর তরকারী। কত কি জিনিষ লাগবে এবং কে রান্না করবে সব ঠিক হল। আমরা আজ রাত্রে রান্না খাওয়া করে শুলুম।

সকালে সব আয়োজন করে রান্না আরম্ভ হল। একটু বেলায় নিমন্ত্রিতেরা একে একে এলেন ও সকলে খেয়ে বেশ পরিতৃপ্ত হলেন। কাপড় যাকে যা দেবার দেওয়া হল। আমরা রওয়ানার জন্য প্রস্তুত হলুম। আমাদের সঙ্গে কিছু পুরি আর হালুয়া প্রেমবল্লভবাবুর ছেলে বেঁধে দিল। আমি প্রেমবল্লভ-বাবুর ছেলেকে আলিঙ্গন করে রওয়ানা হলুম।

১২

পথ সোজা, মনে কৈলাশ হয়ে আসার সন্তোষ, পা-যেন বিনা চেষ্টায় চলেছে। মাইল দুয়ের পর সেই খাল যার উপরকার পুল ভেঙ্গে যাওয়ায় সেবার আমরা আটকে যাই ও প্রধানের বাড়ী গিয়ে থাকি। পুল পার হতেই একজনকে আসতে দেখে মনে হল এই সেই প্রতাপসিং। এর চেহারা দেখে তাকে মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করায় সে বলল হ্যাঁ সেই প্রতাপসিং। তাকে মনে করালুম যে সেবার তার বাড়ীতে আমি ও মা ছিলুম। তাকে দেখে বড় আনন্দ হল। তার সঙ্গে এরকম দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি। এর সঙ্গে একটি বৃদ্ধা। আমি তার মার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে দেখাল এই আমার মা। আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করলুম ও তাঁর জন্য যে বস্ত্র এনেছিলুম তা দিলুম। এরকম একেবারে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে আশ্চর্য্য হলুম।

আজ বালুয়া কোটে থাকা হবে। বেশ সোজা রাস্তা, সন্ধ্যার আগেই বালুয়া কোট পৌঁছলুম। পরদিন কিছুদূর গিয়ে আসকোটের মাইলতিনেক আগে একটা জায়গায় রাত্রে রইলুম। এখানে থাকবার ঘর পাওয়া গেল। এখান থেকে পিথোরাগড়ে যাবার রাস্তা ঘুরে গেছে।

পরদিন পথে মাঝে মাঝে কৈলাশযাত্রী দলের সঙ্গে দেখা হল। এক জায়গায় কয়েকজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা। তাঁরা পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। আরও এগিয়ে আর এক দল বাঙালী। এদের মধ্যে এক স্বামী স্ত্রীকে দেখলুম। যতদূর মনে পড়ছে এঁরা বলেন রানাঘাটে থাকেন। এই প্রথম একজন বাঙালী মহিলাকে কৈলাশ যাত্রায় দেখলুম। বাঙালী কেন দুবার কৈলাশ যাত্রায় কোন মহিলাকেই এপথে দেখিনি।

পিথোরাগড় থেকে মাইল চারেক এদিকে একটা ছোট দোকান, সেখানে সন্ধ্যায় পৌঁছলুম। আজ এখানেই থাকা হল। আজ আমাদের উনিশ মাইল চলা হয়েছে। এখান থেকে পরদিন যদি অতি প্রত্যুষে রওনা হতে পারি তবেই পিথোরাগড়ে সকালের ব্যস (bus) ধরতে পারব। এখন শেষ জ্যোৎস্না সেজন্য যখন আমরা উঠে চললুম তখন পূর্ব্বদিক ফরসা না হলেও জ্যোৎস্নার আলো ছিল। আগের দিন উনিশ মাইল হেঁটে এসে আজ এই শেষ রাত্রে উঠে চলতে ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল,

কিন্তু আমরা পিথোরাগড় পৌঁছলুম ঠিক সময়েই। পিথোরা-গড়ের কাছে পাহাড়ের রাস্তা ভাঙা। আমাদের একটু ঘুরে লম্বা পথে যেতে হল। সেখানে চড়াই উতরাই দুইই ছিল। অনেকদিন পরে চোখে ব্যস (bus) দেখলুম। এইখানে দোকানে কিছু খাবার কিনে খেয়ে ব্যসে উঠলুম টনকপুরের জন্য।

স্বামীজী বললেন তিনি এখন গয়া না গিয়ে কাশ্মীরে অমর-নাথ দর্শনে যাবেন। টনকপুর পৌঁছে সেইজন্য উনি বেরেলীর গাড়ীতে বসলেন পাঠানকোট যাবার জন্য, আর আমরা তার কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মৌয়ের গাড়ীতে উঠলুম। স্টেসনে নানা রকম খাবার বিক্রি হচ্ছে, অনেকদিন এসব রকমারি জিনিষ খাওয়া হয়নি কাজেই যা আনছে তাই কিছু কিছু কিনে আমরা খেতে লাগলুম। এইটাই ভুল হয়, যার জন্য আমাদের পেটের গোলমাল হয়েছিল। ঠাণ্ডা পাহাড় থেকে নেবে জষ্টি আষাড়ের গরমের মধ্যে এসে কিছুদিন খাওয়ায় একটু সাবধান থাকা উচিত। যাঁরা করেন না তাঁরা প্রায়ই ভোগেন আর বলেন পাহাড় থেকে এলে পেট খারাপ হয়। কিন্তু পাহাড়ের দোষ নয়, পাহাড় হজম শক্তি ভাল করে দেয়। দোষ আমাদের খাওয়ায় লোভ আর অসাবধানতা।

আমরা লক্ষ্মৌতে একদিনের জন্য নাবলুম। সত্যসিন্ধুবাবু সোজা গয়া যেতে চাইলেন। তাঁর জন্য ব্যবস্থা করে ওঁকে গয়ার গাড়ীতে বসিয়ে দিলুম। আমরা রিকশ করে আর্য্য

নগরে একদিনের জন্য যাই। সেখানে একজন ছিলেন তাঁর ওখান থেকে সেই আবার কলকাতা।

অতীতকে ভুলে যাওয়াই ভাল, কিন্তু কৈলাশকে ভুলে যেতে পারি না। কৈলাশের কথা মনে এলেই অতীতের কত স্মৃতি জেগে ওঠে যাতে মনে অবসাদ আসে। অতীত চলে গেছে, তার পিছনে ছুটে লাভ নেই, তাকে ধরা যায় না, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই সে আরও দূরে গভীর অন্ধকারের মধ্যে চলে যায়। তবু আমরা তার দিকে বার বার তাকিয়ে দেখতে চাই আর কত দুঃখের স্মৃতি মনে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিই। মানুষ যদি ঘাড় বেঁকিয়ে অতীতের দিকে না চাইত আর আবার উল্টোদিকে ভবিষ্যতের ভিতর আশা কল্পনা না ছোটাত, বর্ত্তমানের উপরই দৃষ্টি মন স্থির রাখত, তাহলে অনেক দুঃখ কষ্ট হতে রক্ষা পেত। কিন্তু মানুষ তা পারেনা, অতীতের ছায়ার বাইরে আসতে পারে না। কষ্ট, দুঃখ, অভাব সবই তীব্রতর হয় যখন মনে পড়ে সেই সময় যখন তাহা ছিল না, এবং আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে যখন মনে হয় পূর্ব্বে কোন সময়ের সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা। সেই রকম ভবিষ্যতের শূন্যের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার আকাশে আশার পতাকা উড়াইলে দুঃখ, নিরাশা, অশান্তি, ক্ষোভ, অনিবার্য্য। মনে হয় ঘুমের যেমন sleeping pill করা হয়েছে সেই রকম যদি memory pill (Reflections and Reactions, page 211) আবিস্কৃত হয় যাহা খাইলে স্মৃতি

মুছিয়া যাইবে, তাহলে মানুষের অনেক দুঃখ অশান্তি চলিয়া যায়। রাত্রে এই একটা পিল খাইয়া শুইলে সকালে নূতন জীবন, অতীতের ছায়ামুক্ত নূতন উৎসাহ। আমাদের ষড় ঋপু দমনের জন্য নানা ধর্ম্মগ্রন্থে নানা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ফল হয়নি, দৈনিক মেমরি পিলের ব্যবহার যদি বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে অন্ততঃ বহু পরিমাণে ঋপুগুলি আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে, কারণ এক দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেগুলি বেশি উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারিবে না। কেবল ব্যক্তিগতভাবেই নয়, সামগ্রিক ভাবেও, মেমরি পিল মানবের ও জগতের অনেক কল্যাণ সাধিবে। মানবের ইতিহাস ত লোভ, হিংসা, ক্রোধ, ঝগড়া, মারামারি, লড়াই, যুদ্ধের ইতিহাস। এই মারামারি, লড়াই, একদিনের কয়েক ঘণ্টার ঝগড়া বিরোধে হয় না, তার জন্য ঝগড়া বিরোধ পাকিয়া উঠিবার সময় চাই। মেমরি পিল আগের দিনের ঝগড়া বিরোধের স্মৃতি মুছিয়া দিবে। মেমরি পিলের কথা পরিহাসচ্ছলে বলছি না, অনেক সময়েই মনে হয়, কেবল আমারই নয়, নিশ্চয় অনেকেরই মনে হয়, এই রকম একটা উপায় হইলে ভাল হয় যাহা অতীতকে মনের পর্দা হইতে পুঁছিয়া দেবে।

কৈলাশ শিখরে অধিষ্ঠিত কৈলাশপতির কথা ভাবিলে মনে হয় তাঁহার কাছে কি মেমরি পিলের মত কিছু একটা আছে, নচেৎ কি করিয়া কালের পুঞ্জিভূত স্মৃতি লইয়া অমন স্থির ভাবে বসিয়া আছেন? কত ধ্বংস-চুরমার দেখিয়াছেন, জীবের কত

শোক দুঃখ বিষাদের রোল, দীর্ঘশ্বাস শুনিয়াছেন, তবু অবিচলিত হইয়া যুগ যুগ একাসনে বসিয়া আছেন কি করিয়া বুঝিতে পারি না। নয় তাঁহার মেমরি পিলের formula জানা আছে, নয় তিনি বুঝিয়াছেন যে যাহা আসে, যাহা ঘটে, তাহাতে বিচলিত না হইবার চেষ্টাই শ্রেষ্ঠ সাধনা এবং ঐ সাধনাই জীবনে যতটুকু সুখ শান্তি পাওয়া সম্ভব তাহা আনিতে পারে। বড় কঠিন সাধনা নিশ্চয়ই, আমরা কেহই তা করিতে পারি না, কঠিন চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হই না। অথচ বুঝি যে তা ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু আমাদের এরকম অসহায়, নিরুপায় করা হয়েছে কেন, এ প্রশ্নের ছেলে ভোলান রকমারি কথা শুনি, পড়ি, কোনটাই মনে লাগে না। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অভিভূত হইয়া ভাবি মানুষের উপর সৃষ্টিকর্ত্তার কেন এরূপ দারুণ অবিচার, এই দারুণ নির্যাতন। যদি মানুষকে দুঃখ কষ্ট শোক অশান্তি দেওয়া তাঁহার লীলার একটা অংশ ত বেশ তাহা দিতেন, তবে ঐসব দুঃখ কষ্ট, জ্বালা ভুলিবার ক্ষমতা মানুষকে দিলেন না কেন ? তিনি কি মানুষকে দুঃখ জ্বালা দিয়াই লীলা ঐখানে শেষ করিতে চান না, মানুষকে দুঃখ জ্বালার মধ্যে ফেলিয়া তাহার আর্ত্তনাদ, তাহার কাতরতা দেখিতে ও তাহা উপভোগ করিতে চান ?

জানি আমার স্পষ্টভাবে এইরকম প্রশ্ন তোলায় অনেকেই বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন, ও কর্ম্ম, কর্ম্মফল ইত্যাদি

অনেক রকম তত্ত্বকথা শুনাইবেন, যে তত্ত্বের বিষয় তাঁহারা হয়ত কখন চিন্তা ও বিচার করেন নাই, কেবল কাহারও নিকট শুনিয়া বা কোন বইতে পড়িয়া মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের সবিনয়ে ও সম্মানের সহিত আমি এইটুকু বলিতে চাই যে বেশ কথা, তবে উহা দুঃখী শোকার্ত্তকে বলিয়া তাহার জ্বালার উপর আরও জ্বালা না দিয়া, নিজের উপর ঐরূপ তত্ত্ব-উপদেশ প্রয়োগ করুন। করিলেই দেখিবেন যে নিজের উপর ওরকম তত্ত্বকথা কার্য্য করে না, তাতে শোক দুঃখের লাঘব হয় না।

যাহা হোক আমার মনে আরও প্রশ্ন ওঠে যে ব্রহ্মাণ্ডে এত রকম সৃষ্টি, কত গ্রহ, তারা, নিহারিকা, পাহাড়, নদী, বৃক্ষ—তারা হচ্ছে, আসছে, উঠছে, পড়ছে, চলে যাচ্ছে। মানুষও সেইরকম আসছে, উঠছে, পড়ছে, চলে যাচ্ছে। সৃষ্টির যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে ত ঐসব বস্তুর অপেক্ষা ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা সে উদ্দেশ্য যে কিছু বেশি সাধিত হয় তাহার কোনও প্রমাণ নিদর্শন দেখা যায় না। সৃষ্টির recordয়ে মানুষের জীবন কোন দাগ, কোন রেখাই টানে না। তবে কেন মানুষকে অনুভূতি, feelings, sentiments, emotions দেওয়া যাহা হইতে তাহার জীবন সুখ-দুঃখের, আশা-নিরাশার, মোহ-মায়ার খেলায় নিস্পিড়িত ?

এ প্রশ্নের উত্তর না থাকিলেও যেদিন কৈলাশের দিকে চেয়ে তাহার উপর যোগাসনে অধিষ্ঠিত শিবের স্থির, প্রশান্ত

মূর্ত্তি, তাঁহার কালজয়ী অবিচলতা, ধ্যান দৃষ্টিতে দেখি তখন সে সময় মনে স্থিরতা এসেছিল, প্রশ্ন ওঠেনি। অতীত মন হইতে সরিয়া গিয়াছিল। দৃষ্টি মহাশূন্যের মধ্যে চলে গিয়েছিল যার মধ্যে পৃথিবী আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। ক্ষোভ, দুঃখ, কামনা, বাসনা, উদ্দেশ্য সবই সে সময় কোথায় মিশে গিয়েছিল। এখনও যখন অতীতের অতল সাগর হইতে স্মৃতির জোয়ার মনের উপর ছাপিয়া আসে সেই কৈলাশশিখরাধিষ্ঠ প্রশান্ত মূর্ত্তি স্মরণ করিলে ঐ জোয়ারের মুখ পাল্টাইয়া যায়।

———